আমপারার ভাবানুবাদ

(শায়খ মুহাম্মাদ আল গাজালির ‘এ থিম্যাটিক কমেন্টারি অন দ্য কুরআন’র আলোকে)

অনুবাদঃ আলী আহমাদ মাবরুর

সুরা আল ফাতিহা

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি।

সুরা তাওবা ছাড়া মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতিটি সুরা শুরু হয়েছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম কথাটি দিয়ে। সুরা ফাতিহাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিটি সুরার শুরুতে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া হয়; কারণ এই নামটি এতটাই পবিত্র নাম যা সব ধরনের অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই সুরা নাযিল হয়েছে। এ সুরাটি কুরআনের একেবারে মূল উপজীব্য বিষয় ও চেতনাকেই প্রতিনিধিত্ব করছে। যদিও সুরাটি আকারে খুব একটা বড়ো নয় তবে এর ব্যাপকতা অনেক বেশি। সুরা আল ফাতিহা ইসলামের অনুপম চেতনাকে সামনে নিয়ে আসে এবং আল্লাহর সাথে মানুষের চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলত, এই চুক্তির আলোকেই পৃথিবীতে মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। সুরা ফাতিহা একইসঙ্গে আল্লাহ তাআলার দরবারে বান্দার পক্ষ থেকে অনিন্দ্যসুন্দর একটি দুআ হিসেবেও স্বীকৃত। এই সুরায় আকুলভাবে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে মানুষকে সঠিক পথের হিদায়াত দেখানো হয়, তাদেরকে সত্য পথের উপর অটল রাখা হয়। যাতে করে, মানুষ তার জন্য নির্ধারিত নেয়ামত ও বরকত অর্জন করতে পারে। এবার আসুন এই সুরার আয়াতগুলো নিয়ে আমরা একটু পর্যালোচনা করি।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি এই বিশ্বজগতের প্রতিপালক।** এই আয়াতটির মাধ্যমে তিনটি মূল চেতনাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

১. প্রথমত, এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশালতা, উদারতা এবং নিখুঁত কর্মকান্ডের প্রশংসা করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের জন্য অসীম কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয়ত, সেই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা হয়েছে যিনি সব কিছুর স্রষ্টা এবং যোগানদাতা। এবং

৩. তৃতীয়ত, সেই সৃষ্টিকর্তা এবং মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করা হয়েছে যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির উপর অসীম আনুকূল্য এবং রহমত দান করেছেন; উদারতা এবং করুণা প্রদর্শন করেছেন।

যখনই কোনো ব্যক্তি এই শব্দগুলো উচ্চারণ করে কিংবা এই আয়াতগুলো পাঠ করার মধ্য দিয়ে নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করে; তিনি তখন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে মহিমান্বিত করেন না। পাশাপাশি, আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাও জানান।

আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বজগতের প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চয় করে দাবি করছি, এই পৃথিবীতে এবং এর বাইরে গোটা বিশ্ব জগতে, একেবারে ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে অনেক বিশাল বিশাল যে সৃষ্টি রয়েছে তার একমাত্র অধিকর্তা এবং মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই মানুষের, প্রাণীর, গাছপালার, ফেরেশতার, গ্রহ উপগ্রহ, তারা, নক্ষত্রপুঞ্জসহ যে কোনো বিদ্যমান পদ্ধতি, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সবকিছুর একমাত্র মালিক। এই পৃথিবীতে যা কিছু ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু আসবে তার সবকিছুই আল্লাহ তাআলার অধীনে এবং তাঁর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণাধীন। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি উপকরণ আল্লাহর রহমত, করুনা এবং নিয়তের উপর নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ পাক এই প্রসঙ্গে বলেন

"বিশ্বজগতের পালনকর্তা, ভূ-মন্ডলের পালনকর্তা ও নভোমন্ডলের পালনকর্তা, আল্লাহর-ই প্রশংসা। নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা আল জাসিয়া: আয়াত ৩৬-৩৭)

সুরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, **"যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।"** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায়, মানুষ এবং অন্য সকল সৃষ্টি মূলত আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের উপর ভর করেই বেঁচে থাকে। এই নেয়ামতের পরিমাণ ও মাত্রা যেকোনো পরিমাপযোগ্য সীমানার ঊর্ধ্বে। এরপরও আমরা অধিকাংশ সময় পাপাচারে আর অকৃতজ্ঞতায় ডুবে থাকি। আমাদের মধ্যে ঔদ্ধত্য এবং হামবড়া ভাব চলে আসে। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর তাঁর করুনাধারা বর্ষণ করতে কোনো ধরনের কার্পণ্য করেন না। কৃতজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞ সকল বান্দাই একইভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতগুলোকে উপভোগ করে বেঁচে থাকে।

তার পরের আয়াতে আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, **"তিনিই শেষ বিচারের দিনের মালিক।"** এই আয়াতটি দিয়ে সেইদিনকে বোঝানো হয়েছে যেদিন নতুন আরেক জীবন শুরু হবে- যা আমাদের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী জীবনের একেবারেই বিপরীত। বর্তমান সময়ে, আমাদেরকে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবন যাপনে এমনভাবে অভ্যস্ত করে তোলা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনকে আমাদের মাথা থেকে মোটামুটি সুকৌশলে বিদায় করেই দেওয়া হয়েছে। অনেকে আবার এই শেষ বিচারের দিনকে নিয়ে উপহাস বা পরিহাসও করে। শিক্ষা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে শেষ বিচারের দিন সংক্রান্ত ধারনাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ এ শেষ বিচারের দিনই মানুষের অস্তিত্বের মূল বাস্তবতা ও কার্যকারণ। আমাদের দায়িত্ব ছিল শেষ বিচারের দিনের জবাবদিহিতাকে কেন্দ্র করেই গোটা জীবনটাকে যাপন করা, সকল কাজ ও প্রক্রিয়াকেও সেই মোতাবেক পরিচালনা করা।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, **আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।** প্রতিটি সৃষ্টির টিকে থাকার জন্য আল্লাহর নেয়ামত এবং তাঁর আনুকূল্যের প্রয়োজন। রাসুল (সা.) সবসময় আল্লাহর কাছে এভাবে দুআ করতেন যে, "হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন। যাতে আমি সব সময়, সবচেয়ে ভালো উপায়ে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং আপনার ইবাদত করতে পারি। তিনি আরো পরামর্শ দিয়েছেন যে, "যখন তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়বে, তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আবার যখন তোমার কোনো ধরনের সাহায্যের দরকার হবে তখনো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

এর পরের আয়াতটি হলো, **"আমাদেরকে সহজ সরল সত্য পথের সন্ধান দিন তাদের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন"** (সুরা ফাতিহা: আয়াত ৬-৭)

এই আয়াতটি সংক্ষিপ্ত হলেও দুটো মৌলিক বিষয়কে এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। এজন্যই এই আয়াতটি ব্যতিক্রম। যে ব্যক্তি সহজ, সরল ও সত্য পথ অনুসরণ করবে তিনিই আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক পথের সন্ধান পাবেন। কেবলমাত্র এ একটি পথ দিয়েই আল্লাহর কাছে পৌঁছানো সম্ভব। আল্লাহর প্রদত্ত ধর্মই একমাত্র ধর্ম- যা সকল নবি এবং রাসুলেরা প্রচার করে গেছেন। এ ধর্মের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলাই হলেন একমাত্র স্বত্ত্বা- যিনি সকল সৃষ্টির নিকট পূর্ণ আনুগত্য দাবি করতে পারেন। সবার কাছ থেকে পূর্ণ প্রশংসার পাওয়ারও একমাত্র হকদার তিনি। আল্লাহ তাআলার অনুমোদনের উপরই প্রত্যেক সৃষ্টি এবং বিশ্বজগতের প্রতিটি কার্যক্রম ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

সমসাময়িক অনেক ধর্মের অনুসারীদের মাঝে ইসলামের এই চেতনাটিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সংশয়-সন্দেহ ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে যে, যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যাই হোক না কেন, সবকিছুই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল। আর এই বাস্তবতা পার্থিব জীবন ও পরকালীন স্থায়ী জীবন- উভয়ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। মানুষ কিংবা অন্য যে কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। যারা এই সত্যকে অস্বীকার করবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে পতন এবং অসহনীয় বিপর্যয়।

যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি স্বেচ্ছায় আনুগত্য করবে, তারা নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসুল হযরত মুহাম্মদকে (সা.) অনুসরণ করবে। আর এই সব সফল ব্যক্তিরাই সত্য, সরল ও সঠিক পথ খুঁজে পাবে। কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ পাক এই বিষয়ে বলেছেন

> "যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন নবি, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।" (সুরা আন নিসা: আয়াত ৬৯)

আর যারা অন্য কাউকে খোদা হিসেবে মানবে কিংবা আল্লাহর হুকুমের পাশাপাশি অন্য কারো হুকুম মেনে চলবে তাদের অবস্থা হবে শোচনীয়। তারা পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে এবং আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। মানুষের উচিত নিজেদের ভাবনাগুলোকে সবসময় সঠিক এই দর্শনের উপরে রাখা এবং নিজের জীবনের লক্ষ্যগুলোকেও এই দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই নির্ধারণ করা। কেউ যদি একবার সত্যপথকে চিনে নিতে পারে বা হেদায়াতের দেখা পায় তাহলে তার উচিত একনিষ্ঠভাবে সেই সত্য পথের ওপর অটল থাকা। হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করা এবং অন্য সকল সৃষ্টির প্রতিও দরদি ও কল্যাণকর ভূমিকা রাখা।

আল্লাহ তাআলা বারবার এই সুরাটি পাঠ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেই অনুযায়ী, প্রতিটি নামাজেই মুসলমানরা এই সুরাটি তেলাওয়াত করে। কেননা, এই সুরাটি মানুষকে সতেজ ও কর্মমুখর রাখে এবং স্রষ্টার সাথে বান্দার একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি করে দেয়। সুরা আল ফাতিহা মৌলিকভাবে সততা, বিশুদ্ধতা এবং ইসলামের অনুপম আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সুরাটি হল একজন বিনয়ী ও সিজদাবনত বান্দার পক্ষ থেকে তার অসীম ক্ষমতাশালী একমাত্র রবের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, আনুগত্য, বিনয় এবং ভক্তির বহিঃপ্রকাশ।

সুরা আল ফাতিহার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুলের (সা.) একটি হাদিস এরকম।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে।

অতঃপর বান্দা যখন বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য); আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু); আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুনাবলী বর্ণনা করেছে, গুণগান

করেছে। অতঃপর সে যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (শেষ বিচারের দিনের মালিক), তিনি বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। আর কখনো বলেছেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার উপর সোপর্দ করেছে। সে যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); তিনি বলেন- এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। যখন সে বলে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, যারা ক্রোধ নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়); তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায় তা সে পাবে। (সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৭৬৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

আমরা এই বরকতময় দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি নিজেদের আত্মার কল্যাণের স্বার্থে। প্রতিদিন যেভাবে আমরা গোসল করে নিজেদের শরীরকে পরিষ্কার করি ঠিক একইভাবে এই সুরা পাঠ করে আমরা আমাদের অন্তরাত্মাকে বিশুদ্ধ করি। কেউ যদি নিয়মিত শরীর পরিষ্কার না করে তাহলে তার শরীর যেভাবে নোংরা হয়ে যায় তেমনিভাবে এই সুরা নিয়মিত পাঠ না করলে এর উপকারিতাও পুরোপুরিভাবে ধারণ করা যায় না। একই সঙ্গে, নিয়মিত এই সুরা পাঠ না করলে প্রাপ্ত উপকারিতা অনেকটা সময় কার্যকরও থাকে না।

মানুষের ফিতরাত, মানসিকতা এবং আচার-আচরণই এমন যে, খুব স্বল্প সময়ে দোয়া করে ব্যবহারিক জীবনাচরণকে স্থায়ীভাবে ঠিক রাখা যায় না। প্রতিটি মানুষের তাই একটু পর পর আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবেই বেপরোয়া এবং সহজাতভাবেই সে আনুগত্যের বাইরে চলে যেতে চায়। এই প্রেক্ষিতে নামাজ আদায়, দোয়া প্রার্থনা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকে মানুষের প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা উচিত। কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

> "অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নামাজ আদায় করা মুসলমানদের উপর ফরজ।" (সুরা নিসা: আয়াত ১০৩)

সুরা ফাতিহা হলো এমন একটি বরকতময় সুরা যেই সুরার কয়েকটি লাইনের মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে প্রকৃত অর্থে এবং যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারি। এই সুরার মাধ্যমে মালিক ও বান্দার সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। এই সম্পর্কে দাবি হলো, একজন বান্দাকে আল্লাহ তাআলার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। সব সময় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে। একজন একনিষ্ঠ ও তাকওয়াবান বান্দাকে হরহামেশাই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে সে অব্যহতভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নেয়ামত, করুণা ও দয়া ভিক্ষা পেতে থাকে।

সুরা আন নাস

সুরা আন নাস শুরু হয়েছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন একটি আকুতির মাধ্যমে..

বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের পালনকর্তার কাছে, মানুষের অধিপতির কাছে, মানুষের একমাত্র ইলাহের কাছে।

এই আয়াতগুলোতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে মানুষ ও জ্বীনরূপী শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। মুলত, মানুষ হিসেবে আমাদের কোনো ধারনাই নেই যে কীভাবে জ্বীন কাজ করে কিংবা জ্বীনের আচরণ ও কর্মকৌশল কী রকম হতে পারে। তবে আমরা আমাদের জীবনে প্রায়শই জ্বীনের প্রভাব ও উপস্থিতি টের পাই। নিজেদের এই অসহায়ত্বটি থাকার কারণেই আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াটা বরং জরুরি হয়ে যায়। যাতে আমরা এই সব অপশক্তির কুচক্র, কুটকৌশল এবং অসৎ ইচ্ছার প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত থাকতে পারি।

এরপর এই সুরায় আরো বলা হয়েছে যে, **আমরা আশ্রয় চাই শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্নগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।**

-এই আয়াতগুলোতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, শয়তান মানুষের মনে পাপাচার ঢুকিয়ে দেয়, প্ররোচনা করে, ওয়াসওয়াসা দেয়।

> "আল কুরআনের অন্য আরেক সুরায় আল্লাহ বলেছেন, "এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবির জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জ্বীনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত প্রতারণামুলক কথাবার্তা দিয়ে উৎসাহ যোগায়।" (সুরা আনআম: আয়াত ১১২)

এই আয়াত দিয়ে বোঝা যায় যে, আমাদের মাঝে যারা মানুষ হিসেবে খারাপ তারা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে বা কাজ দিয়েই প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, খারাপ জ্বীনগুলো মানুষকে সংশয়ে ফেলে দেয় এবং তাকে পথভ্রষ্ট করে। ফলে অনিষ্টকারী মানুষ ও জ্বীন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

এই সব অপশক্তিকে মানুষের উপর জোর খাটানোর ক্ষমতা দেয়া হয়নি। মানুষ যদি খারাপ কাজ করতে না চায় তাহলে এই সব প্ররোচকেরা সুবিধা করতে পারে না। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এই জ্বীন ও শয়তানদের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা না থাকলেও এদের প্ররোচণা, বাজে ফন্দি ফিকির, ষড়যন্ত্র, আর ওয়াসওয়াসাই মানুষের জন্য বেশি ভয়ংকর। মানুষকে আল্লাহ নানাভাবে এইসব প্ররোচনার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এত সব সতর্কবার্তার পরও যে মানুষগুলো শয়তান ও অপশক্তিগুলোর ফাঁদে পড়ে, তাদেরকেই এই বিপথগামীতার জন্য দায় নিতে হবে।

সুরা আন নাস মুলত বিপথগামীতা এবং নেতিবাচক ও অনিষ্টকর মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করেছে। কেননা, মানুষের মন যদি খারাপ কোনো চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে তার আচার-আচরণ ও ব্যবহারও এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ মানুষকে, বিশেষ করে ঈমানদারদেরকে সবসময় অনিষ্টকারী মহলের প্ররোচণার বিরুদ্ধে মুক্ত থাকার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। পাশাপাশি, সকল অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় ও পানাহ চাওয়ার জন্যেও আমাদের প্রতি আহবান করা হয়েছে।

সুরা আল ফালাক

যারা আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো সাহায্য চেয়ে আবেদন করে এবং তাঁর কাছেই নিরাপত্তা কামনা করে আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেন। সুরা আল ফালাক এমন একটি সুরা- যা আমাদেরকে অনিষ্টকর সব উপকরণ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার শিক্ষা দেয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও নানা সময়ে বিভিন্ন ধরনের অসৎ অনুভূতি, কুমন্ত্রণা, ও প্ররোচনার প্রভাব থেকে আমরা কিভাবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে পারি, এই সুরা আমাদেরকে সেই নির্দেশনাই প্রদান করে। আল্লাহ বলেন,

> "আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। (সুরা আল আম্বিয়া: আয়াত ৩৫)

আল-কুরআনে আল্লাহ আরও বলেন,

> "আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেনীতে, তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাল আর কিছু রয়েছে অন্য রকম! তাছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে।" (সুরা আল আরাফ: আয়াত ১৬৮)

অনিষ্ট এবং ক্ষতি এই দুটি চরম বাস্তবতা অনেক ধরনের উৎস থেকেই আসতে পারে। যেমন: জীবাণু, কীটপতঙ্গ, প্রাণী এবং সর্বোপরি মানুষ থেকে। এই অনিষ্টকর কাজগুলো দিনের বেলায় হতে পারে আবার মধ্যরাতে হতে পারে। আবার বেশ কিছু অপকর্ম আছে যেগুলো করার জন্য চোর বা ডাকাতেরা গভীর রাতকেই বেছে নেয়।

গোপনে জাদুর চর্চাকারী মহিলাদের কাছ থেকেও এই সুরায় আল্লাহর নিকট আশ্রেয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে, আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী মহিলা জাদুকর এবং ডাইনিদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। অনেকেই এই ধরনের স্বত্ত্বার মাঝে শয়তান এবং বাজে আত্মাগুলোর অস্তিত্বও খুঁজে বেড়ায়- যা মানুষের মধ্যে থেকে হতে পারে আবার জ্বীনের মধ্য থেকেও হতে পারে। আন্দালুসিয়ার প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনে হাজম (র.) এরকম ডাইনির অস্তিত্বকে নাকচ করে দিয়েছেন। তবে অনেক আগে থেকে চলে আসা নানা রকমের পৌরণিক কাহিনী এবং গ্রামে প্রচলিত পুঁথিগানে এই ধরনের অনিষ্টকারী স্বত্ত্বার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রতিটি মানুষের উচিত হিংসা এবং বিদ্বেষের হাত থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। কেননা হিংসা বিদ্বেষের মধ্য দিয়েই অপর মানুষদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশিত হয়। হিংসার কারণেই মানুষ অন্যের ক্ষতি কামনা করে। অন্য কেউ যেন সফল না হতে পারে কিংবা স্বস্তিতে না থাকতে পারে -এ ধরনের প্রত্যাশাও তৈরি হয় হিংসার কারণেই।

পৌরানিক কাহিনীতে অনিষ্টকারী সত্ত্বার বাজে চোখ বা দৃষ্টি সম্বন্ধেও নানা কথা প্রচলিত আছে- যার বেশিরভাগই মিথ্যা, বানোয়াট এবং অতিরঞ্জিত। কিন্তু সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন সব ধরনের অনিষ্টতা থেকেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাঝে কোনো অকল্যাণ নেই বরং প্রচুর কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সূরা আল ইখলাস

(ঈমানের বিশুদ্ধতা)

আল্লাহ এক এবং একক। একাধিক আল্লাহ হওয়ার কোন সুযোগ নাই। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তাঁর কোনো বংশধর নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জিব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> "তোমরা রব হিসেবে দ্বিতীয় কোনো স্বত্ত্বাকে গ্রহণ করো না। তোমাদের রব (প্রতিপালক) তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর।" (সুরা নাহল: আয়াত ৫১)

আল্লাহ আরও বলেন,

> "আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক (ট্রিনিটি তত্ত্ব), একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একমাত্র রব। সন্তান-সন্ততি হওয়ার বিষয়টি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সুরা আন নিসা: আয়াত ১৭১)

তাওহিদের মূলনীতি এবং চেতনাই ইসলামের মূল উপজীব্য বিষয়। আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন থেকেই ধারণা পাই। সেই আলোকে আমরা বলতে পারি আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে, সবকিছু নিতান্তই ক্ষমতাহীন এবং অসহায়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> "আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর শরীক কোনো মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ মুক্ত ও পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, কিন্তু তিনি তা থেকে উর্ধ্বে।" (সুরা আল মুমিনুন: আয়াত ৯১-৯২)

আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে আরো বলেন,

> "যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো রব থাকত, তাহলে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। তিনি যা করেন, তার সম্পর্কে কেউ তাকে প্রশ্ন করতে পারবে না। উল্টো অন্য সবাইকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হবে।" (সুরা আল আম্বিয়া: আয়াত ২২-২৩)

ত্রিনিটি বা ত্রিত্ব ধারনার সমর্থকরা স্রষ্টার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনটি আলাদা সত্ত্বাকে এক জায়গায় মিলিয়ে ফেলেন। একটি স্বত্বা হলো পিতা, দ্বিতীয়টি হলো সন্তান আর তৃতীয়টি হল পবিত্র আত্মা- যা সার্বিক সামঞ্জস্যতার মাঝেই বিরাজমান।

ত্রিনিটির সমর্থকরা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় বিশ্বাস করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, প্রকৃতপক্ষে কে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? এই তিনজনের মধ্যে কোনো সত্ত্বা নাকি তিনজনই একসাথে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? যদি তিনজন মিলে একটি স্বত্ত্বা হয় আর তাদের মধ্যে একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, পৃথিবীতে ফিরে আসার

আগে কী তাহলে সৃষ্টিকর্তা কিছুটা সময়ের জন্য অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন? অথবা যদি ধরে নিই যে সন্তানকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে তাহলে তিনি কেমন খোদা যিনি তার সন্তানের ক্রুশবিদ্ধ হওয়াটাও আটকাতে পারলেন না?

মানুষের যে কোনো কিছুই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা আছে। বলা হয়, কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ গুরুত্ব শুধু এই একটি সুরার (সুরা ইখলাস) মাঝেই নিহিত। কেননা, এই সূরাতে ইসলামের ঈমান ও আকিদা প্রসংগে স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

> "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।" (সুরা ইখলাস: আয়াত ১-৪)

আল্লাহ অদ্বিতীয় এবং তাঁর সাথে তুলনা করার মতো কেউ নেই, কিছু নেই। কোন কিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি নিজে কারো সন্তান নন আবার তাঁরও কোন সন্তান নেই। তিনি হচ্ছেন সকল সৃষ্টির নির্ধারিত অসীম ও একমাত্র গন্তব্য যার কাছে আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

মহাকাশে বিশাল স্থাপনা এবং তাদের সুশৃংখল বিচরণ একাধিক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অনুমোদন দেয় না। একাধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে এত সুন্দর পরিশোধিত ও সুশৃংখলভাবে এ বিশাল মহাকাশ ও মহাবিশ্ব চলতে পারত না। এটা বিশ্বাস করার কোনো যৌক্তিক কারণও নেই যে, পৃথিবীর জন্য একটি খোদা আছে, আবার সূর্যের জন্য আরেকজন খোদা আছে কিংবা উদ্ভিদের জন্য একটা খোদা আছে, প্রাণীবিশেষের জন্য আরেকটা খোদা আছে। অথবা আফ্রিকা মহাদেশের জন্য একজন খোদা আছেন আবার ইউরোপ মহাদেশের জন্য আরেকজন খোদা আছেন।

এই মহাকাশের প্রতিটি উপকরণের সুনিয়ন্ত্রিত বিচরন, তাদের নিয়মিত প্রদক্ষিণ, তাদের গতিপথের মতো বিষয়গুলো এমনভাবে সাজানো যাতে বোঝা যায়, একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ক্ষমতাবান স্বত্ত্বাই এই সবকিছুকে পরিচালনা করছেন। এই মহাশক্তিধর স্বত্ত্বা মানুষের শারীরিক কাঠামোও নির্মাণ করেছেন। মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস, মানুষের যাতায়াত, মানুষের পরিপাকতন্ত্রসহ সবকিছু একই নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ যেভাবে নিজেদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে তাও একজন নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রকের অস্তিত্বকেই প্রমান করে। তাঁর নিয়ন্ত্রনেই মাটি থেকে গাছ বের হয়ে আসছে, প্রতিদিন ভোর আসছে, আবার সূর্য অস্ত যাচ্ছে এরপর রাত নামছে। সূর্য এবং চন্দ্র যেভাবে ঘুরছে- এই সবকিছুই সে মহাশক্তিধর সত্ত্বার ইচ্ছানুযায়ীই হচ্ছে।

কেউ যদি এই বিষয়গুলি নিয়ে ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করে, গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে সে সহজেই বুঝতে পারবে, এসব কিছু একজন মাত্র প্রভুই নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি সার্বভৌম এবং এ কারণেই আমাদের শুধুমাত্র সেই মহাশক্তিধর, চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব রাব্বুল আলামীনের প্রতি সকল প্রশংসা জ্ঞাপন করা উচিত। কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শানেই আমাদের যাবতীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সূরা লাহাব/ মাসাদ

এই সুরাটি শুরু হয়েছে রাসুল (সাঃ) সবচেয়ে আগ্রাসী প্রতিপক্ষ এবং দুর্বিষহ শত্রু, তার চাচা আবু লাহাবের উপর অভিশাপ বর্ষণের মাধ্যমে। বলা হয়েছে

> "আবু লাহাবের হাতদুটো ধ্বংস হোক। এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। তার ধন-সম্পদ যা সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসেনি। (সুরা আবু লাহাব আয়াত: ১-২)

আবু লাহাব ছিলেন তৎকালীন মক্কার অন্যতম সম্পদশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সহসাই তার জীবনে দুঃখ, দুর্দশা আর বিপর্যয় নেমে আসে। প্রাচুর্যতা আর সম্পদ তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবু লাহাব ছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সবচেয়ে ক্ষতিকর একজন শত্রু- যে কিনা নবি মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রচন্ড অসন্তোষ লালন করত। রাসুলকে (সা.) ব্যক্তিগতভাবে অপমান করত এবং রাসুলের (সা.) দাওয়াতি বার্তাগুলোকে বিতর্কিত করার, হেয় করার এবং তাচ্ছিল্য করার কোনো সুযোগ সে ছেড়ে দিত না।

জানা যায়, একদিন কাবা ঘরের নিকটে, সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে রাসুল (সা.) কুরাইশ বংশের নানা গোত্রকে নাম ধরে ডাকলে বেশ কিছু লোক তার ডাকে সাড়া দিয়ে জড়ো হয়। আবু লাহাব নিজেও সেখানে উপস্থিত হয়। এরপর রাসুল (সা.) সমবেত কুরাইশ নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যদি আমি আপনাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পেছনে একদল শত্রু দাঁড়িয়ে আছে যারা আপনাদেরকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আপনারা কী তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করবেন?

উপস্থিত জনতা উত্তর দিলো, "আমরা অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করব কেননা তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলো না।" তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে রিসালাতের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করলেন। ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহর পথে না চলার এবং আল্লাহর সাথে শিরক করার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। রাসুলের (সা.) এই বক্তব্যের পর আবু লাহাব প্রচন্ড উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে প্রকাশ্যে বলে, "তোমার বাকি দিনটুকু নষ্ট হোক, তুমি ধ্বংস হও। তুমি কি এগুলা বলার জন্যই আমাদেরকে ডেকেছিলে?"

আবু লাহাব শুধু একথাগুলো বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং সে রাসুলের (সা.) উপর পাথরও নিক্ষেপ করতে শুরু করে। আবু লাহাবের এই পাশবিক প্রতিক্রিয়ার পরপরই এই সুরাটি নাযিল হয় বলে জানা যায়।

নবি মুহাম্মদের (সা.) যতজন চাচা ছিলেন তাদের মধ্যে আবু লাহাব হল সেই চাচা যিনি সারাটা জীবন রাসুলের (সা.) আকণ্ঠ বিরোধিতা করেছেন। তার এই শত্রুতাভাবাপন্ন মনোভাব তার সন্তান এমনকি স্ত্রীর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। আবু লাহাবের স্ত্রী ছিলেন একজন পাপী, অনিষ্টকারী এবং ক্ষতিকারক মহিলা। তিনিও স্বামীর মতই গোটা জীবন নবি মুহাম্মদ (সা.) কে গালিগালাজই করে গেছেন। এই মহিলাটি ছিলেন তৎকালীন কুরাইশ সম্প্রদায়ের অন্যতম শীর্ষ নেতা এবং সমর বিশেষজ্ঞ আবু সুফিয়ানের আপন বোন।

ইসলামের প্রথম যুগে এই সুরাটি নাযিল হয়। তখনও অবধি, আবু লাহাবের পক্ষে সম্ভব ছিল যাবতীয় অভিযোগ ও সমালোচনা প্রত্যাহার করে ইসলামের পথে ফিরে আসার। কিন্তু সে তার নাফরমানীতে অটল থাকে এবং এই কারনেই এই আল্লাহ পাক সূরাটি নাযিল করেন এবং বলেন

> "খুব জলদিই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিশিখায় এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।" (সুরা লাহাবঃ আয়াত ৩-৪)

আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন যে উক্ত নারী মূলত হিংসার কারণেই নবিজিকে (সা.) গালিগালাজ করতো এবং প্রতিহিংসাবশত সেন ইসলামের বিরুদ্ধেও শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছিল।

ইতিহাসের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে আবু লাহাব কখনোই নবি মুহাম্মাদকে (সা.) একজন এতিম ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি। আবু লাহাবের বিবেচনায় তার বাবা (অর্থাৎ রাসুলের (সা.) দাদা আব্দুল মোতালেব) এবং তার ভাই (রাসুলের (সা.) চাচা আবু তালেব) এই এতিম ছেলেটাকে পেলে পুষে বড়ো করেছে। তাই এ ধরনের এতিম এবং দুর্ভাগা একজন মানুষের উপর আল্লাহর ওহী নাজিল হবে এবং এরকম অসহায় একজন ব্যক্তি নবুওয়াত লাভ করবে এটা আবু লাহাব কোনোভাবেই মানতে পারেনি। আবু লাহাব মূলত কুসংস্কার আর প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিবেচনাবোধকে সম্পুর্ন হারিয়ে ফেলেছিল।

সুরা আন নাসর (বিজয়)

এই সুরাটি নবিজির (সা.) জীবনের শেষ দিকে নাজিল হয়। এই সুরার মাধ্যমে সাহাবিদেরকে এমন কিছু বার্তাও দেয়া হয়েছিল যার মাধ্যমে ধারনা করা যাচ্ছিল, এই নশ্বর পৃথিবী থেকে নবিজির (সা.) বিদায় আসন্ন। যেমন এই সুরাটিতে বলা হয়:

> "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি দেখবেন যে, দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।" (১-৩)

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে (সা.) নির্দেশনা দিচ্ছেন যাতে তিনি আল্লাহর প্রশংসায় এবং আল্লাহর নিকট দয়া, রহমত ও করুণা কামনায় অধিক সময় ব্যয় করেন।

মক্কায় এতদিন যেসব মুর্তির উপাসনা করা হয়েছিল, সেগুলোকে অপসারণ করার মধ্য দিয়েই ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়। এর পরপরই আরবের ভিতরে বিভিন্ন স্থান এবং আরবের বাইরে আরো নানা জায়গায় ইসলামের সুমহান বার্তাকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়। এই সকল দাওয়াতি কাজের মুল প্রতিপাদ্য ছিল, "আল্লাহ এক এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করার সুযোগ নাই এবং আল্লাহ তা'য়ালার সমকক্ষ ও সমতুল্য কোন শরিক নাই।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিশেষ করে, প্রচলিত সকল ধরনের ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার তিনি নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে সময় চলে এসেছিল তার রবের কাছে ফিরে যাওয়ার এবং রবের কাছ থেকে তার সকল আমলের প্রত্যাশিত পুরস্কার গ্রহণ করার। রাসূল (সা.) কঠোর পরিশ্রম করে তার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন এবং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই তিনি অনেক বেশি কষ্টও ভোগ করেছেন।

তিনি গোটা জীবন সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেছেন। তিনি সরাসরি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছেন এবং নিজে একাধিকবার আহত হয়েছেন। যুদ্ধের যে নিঃসঙ্গতা, যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতা এই সবকিছুতেই তিনি প্রভাবিতও হয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তার ঈমান নড়বড়ে হয়নি এবং আল্লাহর প্রতি তার ভরসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ইসলামের বিজয় যাত্রার সূচনা যখন হলোই তখন রাসূলকে (সা.) কেন আরেকটু বেশি সময় সেই স্বস্তিকর দিনগুলো উপভোগ করার সুযোগ দেয়া হলো না? বাস্তবতা হলো এটা কখনোই কোন রাসুলের প্রত্যাশিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। রাসুল (সা.) কখনোই ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ কিংবা পার্থিব আধিপত্য কামনা করেননি। তিনি সবসময় ছিলেন বিনম্র ও বিনয়ী।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল তখন তিনি আরো অনেক বেশি বিনয়ী হয়ে গিয়েছিলেন। এমনও হয়েছে আরবের সবচেয়ে বড়ো বাহিনীর সেনাপতি থাকা অবস্থায়ও তার বাসায় খাবার ছিল না এবং পরিবারের খাবার যোগাড় করার জন্য তাকে নিজের বর্ম জিম্মায় রেখে একজন ইহুদির কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়েছিল।

রাসূল (সা.) হয়তো তার কোন সম্ভ্রান্ত সাহাবীকে তার আর্থিক ঋণের জিম্মাদারীর দায়িত্ব দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বরং নিজের ব্যবহৃত বর্মকে একজন ইহুদির জিম্মায় রেখেই তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন। এমনকি, রাসুল (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখনও সেই বর্মটি ওই ইহুদি ব্যবসায়ীর কাছেই আটকা ছিল।

দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাসুল (সা.) কখনোই কোনো পার্থিব বা ব্যাক্তিগত সমৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করেননি। বরং, যখনই তার দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তারপরই তিনি তার রবের দিদার লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আর এরপরই, আল্লাহর হুকুমে, তিনি সম্মানিত ফেরেশতাগণ এবং পূর্ববর্তী সকল নবি ও রাসূলগণের সাথে শামিল হওয়ার জন্য অনন্তের পথে যাত্রা শুরু করেন। আল্লাহ ঘোষণা করেন,

> “খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে। (সুরা ক্বামার: আয়াত ৫৫)

সূরা আল কাফিরুন (অবিশ্বাসী)

এই সূরাটি শুরু হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে।

> "বলুন, হে কাফেরগন, তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি না। আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরাও তার ইবাদত কর না।" (সুরা আল কাফিরুন: আয়াত ১-৩)

এই আয়াতগুলো আমাদেরকে সুরা বাকারার ১৪৫নং আয়াাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, যেখানে আল্লাহ বলেছেন

> "যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সকল নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানতে পারবেন না। তারা নিজেরাও একে অন্যের কেবলা মানে না।" (সুরা আল বাকারা: আয়াত ১৪৫)

এই আয়াাতগুলোর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়াা যায়া যে, কোনো একটি একক ধর্ম-দর্শনের সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা সম্ভব নয়া। বরং এটা অনেক বেশি বাস্তব হবে যদি আমরা বিভিন্ন মতাদর্শ এবং অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে পারি এবং তাদের সাথে সহাবস্থান করার মানসিকতা পোষণ করতে পারি।

আল কুরআনে সূরা হুদেও আমরা দেখেছি কিভাবে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির গোটা ইতিহাসকে এক জায়াগায় সন্নিবেশিত করেছেন। সেইসাথে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে আর যারা করে না তাদের মধ্যকার চিরন্তন দ্বন্দ্বের বিষয়টাও এই সূরায়া প্রতিফলিত হয়েছে। সূরা হুদে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবি মোহাম্মদকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলেন,

> "আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিনত করতে পারতেন আর তারাও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। (সুরা আল হুদ: আয়াত ১১৮)

মুসলমান হিসেবে অন্য সব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াার মানসিকতা বা ইচ্ছা আমাদের মধ্যে থাকা ঠিক নয়। ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে সিংহভাগ এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, শুধুমাত্র বিদ্রোহ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং শত্রুতা নিবারনের উদ্দেশ্যেই মুসলমানরা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারে। জোর করে কাউকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা যাবে না বলেও তারা মত দিয়েছেন। কেননা জোর করে কারো ওপর কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাস চাপিয়ে দিলে তার পরিণতিতে সংঘাত ও ঘৃণার পরিমাণ আরো বেড়ে যেতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে সুরা আল কাফিরুনের শেষ তিন আয়াতে গুরুত্ব সহকারে এই ঘোষণা দেয়ার তাগিদ দেয়াা হয়েছে যে,

> "এবং তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি না। আবার আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদত কর না। অতএব তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। (সুরা আল কাফিরুন: আয়াত ৪-৬)

একই সঙ্গে, এই সূরার মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয় করবার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর তা হলো,

১. সকল ধর্ম বিশ্বাসের স্বীকৃতি

২. উত্তম প্রতিবেশীদেরকে সম্মান দিতে হবে। এবং সেই সাথে

৩. সকল প্রতিবেশীর সাথে গঠনমূলক সংলাপ করার পথও এ সুরার মাধ্যমে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে

এতকিছুর পরও এটাই বাস্তবতা যে, বিশ্বের অধিকাংশ পরাশক্তি আজ ইসলামকে দমিয়ে রাখতে চায় এবং অব্যহতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের কুটকৌশলও তারা প্রণয়ন করে যাচ্ছে। ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর নেতিবাচক মানসিকতার বিষয়টিকে আমাদের সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। তাহলেই মুসলমানরা নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করতে পারবে। এবং সেই সাথে, শান্তি ও নিরাপত্তার মোড়কে নিজেদের জীবন দর্শনের অনুশীলন করতে পারবে।

সুরা আল কাউসার

(নেয়ামতের প্রাচুর্য)

এই ছোট্ট সূরাটি এমনভাবে নাজিল হয়েছে যেন এর মাধ্যমে নবি মুহাম্মদ (সা.) কে একটি সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর বার্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। জীবনের শুরুর দিকে সকল পুত্র সন্তান হারিয়ে রাসুলের (সা.) মনে যে হতাশার জন্ম হয়েছিল এই সুরার মাধ্যমে তা নিবারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাসুলকে (সা.) সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। ইসলাম আসার পূর্বে আরবের প্রচলিত সংস্কৃতি অনুসারে পুত্র সন্তান হারানোর বিষয়টিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে বিবেচনা করা হত। কেননা এর মাধ্যমে একজন পিতার নাম ও বংশ পরিচয় বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যে ব্যক্তির কোনো পুরুষ সন্তান নেই তাকে আরবেরা আল আবতার বা ছেলে সন্তানহীন বলে অভিহিত করত।

এই সূরা রাসুলকে (সা.) নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দেয়, রাসূলের (সা.) প্রতি আল্লাহ তাআলা যে উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন তা কতটা ব্যাপক। আল্লাহ তাআলা রাসুলকে (সা.) অনেক বেশি সম্মাননা দিয়েছেন বলেই তার উপরে কুরআন নাজিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা রাসুলকে (সা.) ভালবাসেন বলেই তাকে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত এবং শেষ নবি হিসেবে মনোনীত করেছেন। ভালবাসেন বলেই আল্লাহ পাক রাসূলকে (সা.) এমন একটি অবস্থান দান করেছেন যে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি লোক তাকে ভালোবাসে, ভালোবেসে যায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই ভালোবাসতে থাকবে। পৃথিবীতে এমন কোনো মুহূর্ত নাই যখন কেউ না কেউ রাসুলের (সা.) প্রশংসায় দরুদ পাঠ না করছে।

তাই আল্লাহর সকল সৃষ্টির মাঝে নবি মুহাম্মদের (সা.) উচিত সবচেয়ে বেশি খুশি ও কৃতজ্ঞ থাকা। কেননা তিনিই মানব জাতির একমাত্র শিক্ষক, তাদের কল্যাণকামী, মানবতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণ যোগ্য নেতা।

আল্লাহ তাআলা এই সূরার প্রথম দুই আয়াতে বলেন, "নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার (অফুরন্ত প্রাচুর্য ও নেয়ামত) দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (সুরা কাউসার: আয়াত ১-২)

এখানে আল্লাহ তাআলা যে নামাজের কথা বলেছেন তা হল কুরবানির ঈদের নামাজ। যার পরপরই পশু কোরবানি দেওয়া হয়। আমরা ঈদ-উল-আযহার নামাজ পড়ে ভেড়া, গরু, উট অথবা এই জাতীয় প্রাণী আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কোরবানি করি এবং কুরবানীর পশুর গোশত সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করে দেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "যে আপনাকে ঘৃনা করে, ব্যাঙ্গ করে তার ভবিষ্যত রীতিমতো অন্ধকার আর ব্যর্থতায় পর্যবসিত। (সুরা কাউসার: আয়াত ৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যারা ছেলে সন্তান না থাকায় রাসুলকে (সা.) নিয়মিতভাবে খোটা দিয়ে গেছেন ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এখানে আরো একবার এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে নবি মুহাম্মদ (সা.) অনেক বেশি প্রশংসিত এবং তিনি আল্লাহর নেয়ামত, বরকত এবং অবারিত পুরস্কার পাওয়ার সঠিক হকদার।

সূরা আল মাউন

(দান)

ধার্মিক এবং একনিষ্ঠ মানুষেরা সবসময় অপরকে সাহায্য করতে আগ্রহী হন। প্রকৃত ধর্ম সব সময় তার অনুসারীদেরকে দুর্বল এতিম দুস্থ ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করে। সেই সাথে যারা হেদায়েত হারিয়ে ফেলেছে তাদেরকেও সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে সত্যিকারের ধর্ম তার অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করে থাকে।

কেউ যদি এই মহৎ কাজগুলো না করে তাহলে তার আল্লাহর পথ থেকে তার গোমরাহি করার ও বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। সেই সাথে, মানব সৃষ্ট বিভিন্ন বস্তুবাদী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট যাওয়ারও ঝুঁকি থেকে যায়। অথচ এই মানবসৃষ্ট মতবাদগুলোই আজ গোটা বিশ্ব জুড়ে নৈরাজ্য এবং অস্থিতিশীলতা তৈরি করে রেখেছে।

শুধু মুসলমান নয় এমনকি যদি বিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলোও তাদের চেতনা এবং ধর্মীয় আচারাদি সঠিকভাবে পালন করতো তাহলে হয়তো বিশ্বজুড়ে মানবতার বিকাশ ঘটতো এবং বিদ্যমান অনেক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতো।

এই সূরা আমাদেরকে অবহিত করছে যে, ধর্ম মানেই হলো দান-সাদাকা, সহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতি। বলা হচ্ছে,

> “আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে শেষ বিচারের দিনকে মিথ্যা মনে করে? এরা হলো সেই ব্যক্তি, যারা এতিমকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। (সুরা আল মাউন: ১-৩)

পাশাপাশি, এই সূরার মধ্য দিয়ে ধর্মান্ধতাকে খারিজ করে দেয়া হয়েছে এবং লোক দেখানো ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

“অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজি বান্দার, যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না।” (সুরা আল মাউন: আয়াত ৪-৭)

একই সংগে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে যে, দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষকে সহযোগিতাকে এই সুরায় ঈমানের সমার্থক বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব ঠিক যেভাবে অন্যান্য ইবাদতগুলো করতে হবে ঠিক একইভাবে দান-সাদাকাও অব্যাহত রাখতে হবে। দান সদকার বিষয়টিকে যারা অবহেলা করে তাদের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কেও এই সুরায় সতর্ক করা হয়েছে।

সুরা আল কুরাইশ

কোনো কোনো মুফাসসির মনে করেন এই সূরাটি সূরা আল ফীল এর সাথে সম্পূরক একটি সূরা।

ভৌগোলিকভাবে ইউরোপ ও এশিয়াা থেকে আরব অঞ্চলটি অনেক দূরে থাকলেও প্রাচীনকাল থেকেই এই দুই মহাদেশের মাঝখানে বাণিজ্য যাত্রার জনপ্রিয় পথ হিসেবে আরব্য এলাকাটি ব্যপকভাবে সমাদৃত ছিল। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আরবেরা উত্তরে রোমানদের সাথে এবং পূর্ব দক্ষিনে ভারতীয়দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগও ছিল। নিয়মিতভাবে এই দুটি পথেই আরবেরা বাণিজ্য অভিযাত্রায় সম্পাদন করতো। এইসব বাণিজ্য যাত্রায় সব ধরনের মালামাল ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আদান-প্রদানও করা হতো।

মক্কায় বসবাসরত কুরাইশ বংশের লোকেরা এবং আশপাশে অবস্থানরত অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও এই ধরনের বাণিজ্য যাত্রার সুবিধা ভোগ করতো।

“শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের সময় কুরাইশরা যাতে নিরাপদে ও শান্তিতে থাকতে পারে সেই জন্য তাদের উচিত কাবা ঘরের মহান মালিকের ইবাদত করা। কেননা, এই প্রতিপালকই তাদেরকে ক্ষুধার সময় খাবার দেন এবং সব ধরনের বিপদ ও ঝুঁকি থেকে হেফাজত করেন। (সুরা আল কুরাইশ: আয়াত ১-৪)”

যেকোনো ধরনের উন্নতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তাই হলো পূর্বশর্ত। বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আরবেরা বরাবরই মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তাধারার চর্চা করত। ফলশ্রুতিতে, আল্লাহ তাদের উপর ইসলামের সুমহান বার্তা বহন করার এবং পৃথিবীর সকল স্থানের মানুষের কাছে এই অনন্যসাধারণ বার্তাগুলো পৌঁছে দেয়াার গুরুদায়িত্ব প্রদান করেছেন।

সুরা আল ফিল

৫৭১ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়ানরা ইয়েমেনে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে। এই সমর বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল মক্কায় অভিযান চালিয়ে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ঘর কাবাকে ধ্বংস করা। এই বাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। পাশাপাশি ছিল উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হাতি। আরবে এত বিপুলসংখ্যক হাতি দিয়ে এই প্রথম একটি যুদ্ধ প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

বিপুল সংখ্যক হাতি সম্বলিত ইয়েমেন সেনাবাহিনীর আক্রমনের এই খবরটি আসার পর আরবেরা রীতিমত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কেননা এরকম হস্তি বাহিনী মোকাবেলা করার কোন অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। ফলে, অনেকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ভয়ে কাবু হয়ে আশপাশের বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ কাবা ছেড়ে এমনকি নিজেদের বসতবাড়ি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। আবিসিনিয়ান খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা মূলত কিছু ভুল ধারণা থেকে এই অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণও ছিল না। ইয়েমেনের রাজধানী সানায় একটি উপাসনালয় ছিল যেখানে তারা ইবাদত করত। তাই আরবদের কাবা কেন্দ্রিক উপাসনা নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা হওয়ার কারণও ছিল না। কিন্তু তারা সানার উক্ত উপাসনালয়টিকে মক্কার কাবার মত আর্থিকভাবে জমজমাট করতে চেয়েছিল। তবে তেমনটা তারা পারছিল না। এক্ষেত্রে কাবাকে তারা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করছিল বলেই একটা পর্যায়ে তারা কাবাঘর ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তবে আবিসিনিয়ানদের এই সমর অভিযান শেষ পর্যন্ত নিদারুন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই বাহিনীর সদস্যদের উপর আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি পাথর ছুড়ে তাদেরকে রীতিমত বিপর্যস্ত করে দেয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, পাখিদের প্রবল আক্রমণের মুখে আবিসিনিয়া থেকে আসা গোটা বাহিনী পুনরায় ইয়েমেনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় আবিসিনিয়ান বাহিনীর সেনাপতি আবরাহা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়। সূরা আল ফীলে মুলত ইতিহাসের এই জলজ্যান্ত ঘটনাটিকে উপজীব্য করা হয়েছে।

> “আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে গবাদিপশুর খাবারের মত পরিনতি দান করেন।” (সুরা আল ফিল: আয়াত ১-৫)

ইতিহাসবিদরা আরো দাবি করেন যে হস্তি বাহিনীর এই নির্মম পরাজয়ের বছরই নবী মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে তার জন্মটিকে কুরাইশদের ভবিষ্যৎ উন্নতি অগ্রগতি ও নিরাপত্তার সার্থক ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সূরা ফীলের শেষাংশে এবং পরবর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা কুরাইশেও ইসলামের আগমন, তৎকালিন সময়ে কুরাইশদের উত্থান এবং অন্য সকল শহরের তুলনায় মক্কার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা আল হুমাজাহ

(পরনিন্দুক)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঈমানদার বা বিশ্বাসী সম্প্রাদায়ের বিরুদ্ধে যত ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর নেতিবাচক কৌশলটি হচ্ছে পরনিন্দা বা পরচর্চা। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বারবার মুমিনদেরকে অবহিত করেছেন। যেমন:

> "যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত। এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত।" (সুরা আল মুতাফফিফিন: আয়াত ২৯-৩০)

বর্তমান সময়ে এসে নেতিবাচক অপপ্রচার, প্রোপাগান্ডা এবং মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মত বিষয়গুলোর চর্চা শুধু বেড়েছে তাই নয় বরং এগুলোকে অনেক বেশি কার্যকর প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

রাসুলে করীম (সাঃ) এর উপর যখন কুরআন নাযিল হয় তখন মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকদের অধিকাংশই নবিজি (সা.), ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে নানা ধরনের উপহাস ও পরনিন্দা করতে শুরু করে। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা সেইসব নিন্দুকদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

> "প্রত্যেকটি নিন্দাকারীর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ যারা পেছনে থেকে এবং প্রকাশ্যে তোমাদের নিন্দা করে, যারা অর্থ সঞ্চিত করে, বার বার গুনে আর ধারণা করে যে তার অর্থ ও সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে! (সুরা হুমাজাহ: আয়াত ১-৩)

পরনিন্দার অনেকগুলো কৌশল হতে পারে। তার মধ্যে একটা হতে পারে মানুষকে গালিগালাজ করা এবং মৌখিকভাবে ভৎসনা করা, অথবা বাহ্যিক অবয়ব বা পোশাকের মাধ্যমে কাউকে হেয় করা। আবার লেখালেখি করে বা বিদ্রুপাত্মক কার্টুন অংকন করে অথবা অন্য কোনো ছবি এঁকেও কাউকে ছোট করা যায়, অন্য কারো নিন্দা করা যায়। যারা পরনিন্দায় ডুবে থাকে তারা মূলত অলস স্বভাবের হয়। তাদের হাতে প্রচুর টাকা থাকে আবার প্রচুর সময়ও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু ব্যক্তিকে এই ধরনের আজেবাজে কাজ করার জন্য অর্থও প্রদান করা হয়। এমনকি বেতন দিয়েও এসাইনমেন্ট হিসেবে কিছু কিছু ব্যক্তিকে অপরের নিন্দা করার জন্য নিয়োগ করে রাখা হয়। আগে প্রকাশ্যে বা গোপনে এই ধরনের নিন্দা ও পরচর্চা করা হলেও বর্তমান সময়ে এসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে এই পরনিন্দার অনুশীলণ ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। এই সুরাতে এ ধরনের সকল ব্যক্তিকে আল্লাহর অভিশাপ এবং ক্রোধের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সূরা হুমাজাহ'র পরবর্তী অংশে আল্লাহ বলেন

> "নিন্দাকারী অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মধ্যে। আপনি কি জানেন, সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড কেমন? মুলত এটা হলো আল্লাহর অসন্তোষ আর ক্রোধের আগুন যা তাদের যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। অগ্নিকুন্ডের ভেতরে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে আর তারপর আগুন ঐ নিন্দুকদেরকে সকল দিক থেকে গিলে ফেলবে।" (সুরা হুমাজাহ: আয়াত ৪-৯)

অর্থাৎ আল্লাহতাআলা এই ধরনের নিন্দুক ব্যক্তিদেরকে এমনভাবে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করবেন এবং তারা সেখানে এমনভাবে আটকা পড়বে যে কোনভাবেই সেই শাস্তি থেকে বের হওয়ার কোনো পথ খুঁজে পাবে না।

সূরা আল আসর

(সময়)

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি যা কিছু হয়েছে, এই ছোট্ট সুরাটিতে সেই সকল কর্মকান্ডের সারকথা এবং পরিণতিকে সার্থক ও সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন

> "কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। (সুরা আল আসর: আয়াত ১-২)

সময় চলে যায়। মানুষ পৃথিবীতে আসে, বেঁচে থাকে এবং একটা সময়ে মারাও যায়। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে এসেছে। যুগের পর যুগ এভাবেই পার হয়ে গেছে। দেখা যায় একই প্রজন্মের মানুষগুলো পুরোপুরি একরকম না হলেও সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু বাস্তবতার ভেতর দিয়েই তারা জীবন যাপন করে। কিন্তু তাদের গন্তব্য হয়তো একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। পরকালে বা চিরস্থায়ী জীবনে কার গন্তব্য কোথায় হবে এটা নির্ভর করে ব্যক্তির নৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চেতনার উপর। মানব জীবনের বিবেচনায় নৈতিক মানদন্ড অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অনেকেই এই চরম সত্যকে অস্বীকার করে। তবে যতই অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করুক না কেন, নৈতিকতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাতে একটুও কমবে না।

যারা আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব এবং একচ্ছত্র আধিপত্যকে অস্বীকার করে তারা পরকালে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে অসহনীয় শাস্তি ভোগ করবে। অন্যদিকে যারা বিশ্বাসী, এবং নানা ধরনের সংকটের মুখে যারা সত্যকে ধারণ করবে তারাই চিরস্থায়ী জীবনে ভালো থাকবে। প্রকৃত হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বে তারাই বিজয়ী হবে।

প্রকৃত ঈমানদার বা বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা কখনোই খুব বেশি হবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক যুগ এসেছে যখন বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। কিন্তু তাদেরকে অনেক বেশি বিপদ সংকট এবং অস্বস্তিকর মুহূর্তও মোকাবেলা করতে হয়েছে। তবে এই সব কিছুর বিনিময় তাদেরকে আল্লাহ পরকালীন জীবনে উত্তম পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুরা আল আসরে আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত করেছেন যে, যারা ঈমান এনেছেন ও ভাল কাজ করছেন, তারা সেই ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবেন। এই সুরায় অন্যসব বিপথগামী লোক থেকে বিশ্বাসী লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করেছেন। আল্লাহ বলেন

> "কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য পথ ধারণের এবং ধৈর্য্য ধারণ করার পরামর্শ দেয়।" (সুরা আল আসর: আয়াত ৩)

এই সুরার মধ্য দিয়ে রাসুলের (সা.) সাহাবিদের জন্য আনুগত্য এবং ভ্রাতৃত্বকে জীবনের মূল নীতিমালা হিসেবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, সাহাবিরা যে কোনো আলোচনা শেষ করে বিদায় নেয়ার আগে এই সূরাটি তেলাওয়াত করতেন এবং তারপর পরস্পরের সাথে মুসাফাহা করে স্থান ত্যাগ করতেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, "যদি শুধুমাত্র এই একটি মাত্র সুরা দিয়েই দ্বীনের মুল চেতনা ও মর্মবাণীকে ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।"

ন্যায় ও সত্যের বার্তা বহন করতে গিয়ে কিংবা ন্যায় ও সত্যের পরামর্শ দিতে গিয়ে অনেকের উপর জুলুম ও নির্যাতন নেমে আসতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঈমানকে ধরে রাখার জন্য সবর, অধ্যাবসায় এবং দৃঢ় মানসিকতার প্রয়োজন। তাই যারা এই গুনগুলো অর্জন করতে সক্ষম হবেন তাদের জন্যই আল্লাহ তাআলা বিজয়কে সুনিশ্চিত ফায়সালা হিসেবে নির্ধারন করে দেবেন।

সূরা আত তাকাসুর

(দুনিয়াবি মোহ)

এই সুরাটি মূলত মূর্তিপূজারী এবং অন্যন্য সেইসব ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করে নাজিল করা হয়েছে যারা দুনিয়াবি লালসার পাল্লায় পড়ে মোহগ্রস্ত অবস্থায় আছে এবং পরকাল নিয়ে যাদের কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা নেই। এই মানুষগুলো নিজেদের লোভ, কামনা ও বাসনা দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। তারা বর্তমানকে ঘিরেই বেঁচে থাকে এবং বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও প্রশান্তি পাওয়ার লোভেই নিজেদের যাবতীয়া শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করে। কবরে যাওয়া অবধি তাদের গোটা জীবনটাই সম্পদ বিনির্মাণ এবং সম্পদ কুক্ষিগত করার ভেতর দিয়েই কেটে যায়। আল্লাহ তাআলা এই সুরার প্রথম দুটি আয়াতে সেই কথাই বলে দিয়েছেন,

> "প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে মোহগ্রস্ত ও বিপথগামী করে রাখে, এমনকি, যখন তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও।" (সুরা তাকাসুর: আয়াত ১-২)

তাদের আচার আচরণ দেখে মনে হয়, তারা এই বিষয়টাও বুঝতে পারছে না যে, কবরও খুব স্বল্পমেয়াদি একটি আবাস। মূলত পরকালীন জীবনে গিয়ে মানুষকে তার পার্থিব কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সেখানেই দুনিয়ায় সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করা হবে এবং সেই কাজের ভিত্তিতে পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। কবর মুলত সেই পরকালীন জগতের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। কুরআনের অন্যত্র একস্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।" (সুরা ইয়াসিন: আয়াত ৫১-৫২)

যদিও পরকালীন সেই পরিস্থিতির মুখে পড়ে তারা বিস্মিত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন,

> "এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা শীঘ্রই জেনে নেবে। অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা খুব শীঘ্রই জেনে নেবে। এই সত্যটা বরং আরো আগেই তাদের জানা উচিত ছিল।" (সুরা তাকাসুর: আয়াত ৩-৪)

অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ করে আরও বলা হচ্ছে যে,

> "যদি তোমরা জানতে যে নিশ্চিতভাবেই তোমাদেরকে জাহান্নাম দেখতেই হবে।" (সুরা তাকাসুর: আয়াত ৫-৬)

যদি তারা সেই সময় রাসূলের (সা.) আহবানে সাড়া দিতো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করত তাহলে হয়ত তারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু তারা গোমরাহীর পথ বেছে নিয়েছে এবং এই কারণেই আল্লাহ বলছেন,

> “তোমরা নিজেরাই নিজেদের চোখ দিয়ে সেদিন তোমাদের পরিনতি দেখতে পাবে।” (সুরা তাকাসুর: আয়াত নং ৭)

পাশাপাশি, তাদেরকে পৃথিবীতে প্রদত্ত সম্পদ ও অন্যন্য সুবিধাদির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আল্লাহ বলেন,

> “এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। (সুরা তাকাসুর: আয়াত ৮)

তাদেরকে আরো বলা হবে যে,

> “তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই অর্জন ও কুক্ষিগত করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার এবং পাপাচারেই ব্যস্ত ছিলে।” (সুরা আহকাফ: আয়াত ২০)

এ পার্থিব জীবনে মানুষ যে সম্পদ এবং ক্ষমতা অর্জন করবে সে ব্যাপারে অবশ্যই আখেরাতের জীবনে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। কেন, তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অফুরন্ত নেয়াামত পেয়েও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ানি সে ব্যাপারেও তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যে সুখ স্বাচ্ছন্দ তা কখনই স্থায়ী নয়। বরং পার্থিব জগৎ নিয়ে অতি আগ্রহের কারনে এই মানুষগুলোকে পরবর্তীতে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অন্য একটি স্থানে বলেন

“এটা একারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং সেখানে তোমাদের আচরণও অনেক বেশি অহংকার ও ঔদ্ধত্যে ভরপুর ছিল। (সুরা মুমিন/ঘাফির: আয়াত ৭৫)

সূরা আল কারিয়াহ

(বিপর্যয়)

তামাম সৃষ্টির পুনরুত্থানের ঠিক আগ মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যাবে যাতে পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠবে। সকলেই সেই শব্দ শুনতে পাবে। এই ঘটনাটা সম্বন্ধে কুরআনের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে যেখানে আল্লাহ বলেন,

> "শুন, যে দিন এক আহবানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহবান করবে। যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরত্থান দিবস।" (সুরা ক্বাফ: আয়াত ৪১-৪২)

প্রত্যেকেই তখন ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর নানা ধরনের আশঙ্কা নিয়েই উঠে দাঁড়াবে। সবাই রীতিমতো কাঁপতে থাকবে আর যা ঘটছে তা দেখে শিউরে উঠবে। এই প্রসংগে এই সুরায় আল্লাহ বলছেন,

> "এই দিনটিই হলো সেই ভয়ংকর বিপর্যয়ের দিন। এই বিপর্যয়টা আসলে কী? আপনি কী এই বিপর্যয় সমন্ধে ভালোভাবে জানেন? মানুষ সেদিন বিক্ষিপ্ত পোকা মাকড়ের মতো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াবে আর পাহাড়গুলো তুলোর মত ভেসে বেড়াবে। (সুরা আল কারিয়াহ: আয়াত ১-৫)"

পাহাড়গুলো একে একে ধসে পড়বে এবং নিছক ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। আর মানুষগুলোও পিপড়া বা পোকামাকড়েরর মত বিচ্ছিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে এলোমেলো ছুটোছুটি করবে। প্রত্যেকেই তার মত করে ছুটে বেড়াবে কিন্তু কেউ জানবে না সে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে। যদিও ততক্ষণে তাদের সকলের ভাগ্য এবং পরিণতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।

> "অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখীজীবন যাপন করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া দোযখ।" (সুরা আল কারিয়াহ: আয়াত ৬-৯)

এই আয়াতে সুখী জীবনটিকে রাদিয়াহ শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখানে এই সুখ বা স্বস্তির বিষয়টি মাতৃত্বের সাথে মিলিয়ে বোঝানো হয়। মা শব্দটি আরবি ভাষায় রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সময় অনেকেই পরিত্রান পাওয়ার জন্য বলে যে আমি যদি মায়ের কোলের মত নিরাপত্তা ও স্বস্তি পেতে পারতাম। রাদিয়াহ শব্দটির তাৎপর্যও অনেকটা তাই। যারা স্বস্তিতে থাকবেন তারাও মুলত মায়ের কোলের মতই শান্তি ও স্বস্তির দেখা পাবেন।

অপরদিকে, যাদের নেক আমলের পরিমাণ যৎসামান্য অথবা যাদের কাজগুলো আল্লাহ তাআলার বিবেচনায় গুরুত্বহীন তাদের প্রত্যেককে সেদিন জাহান্নামের আগুন গিলে ফেলবে। হাবিয়া দোযখের বর্ননা দিতে গিয়ে সুরার শেষাংশে আল্লাহ বলেন,

> "আপনি জানেন তা কি? এটা হলো প্রজ্জ্বলিত অগ্নি! (সুরা আল কারিয়াহ: আয়াত ১০-১১)

সূরা আল আদিয়াত

ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনাকে ভালোভাবে গেঁথে দিয়ে প্রত্যাশিত আকারে বিকশিত করার জন্য সবার আগে এই বিশ্বাসকে সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই ধরনের সংরক্ষনমুলক নীতি না থাকলে সেই সুযোগে মিথ্যা ও প্রতারণা বাধাহীনভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে। মানব ইতিহাসে এরকম অসংখ্য দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জালেম শাসকের আবির্ভাব হয়েছে যারা নিছক শক্তির জোরে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর খবরদারি করেছে এবং ন্যায় বিচার, মুল্যবোধ, মানবিক মর্যাদা ও সম্মানকে নিয়মিতভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এটাই বাস্তবতা। শুধু তাই নয়, অনেকেই দাবি করেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, কারো অধিকারকে যদি সঠিকভাবে রক্ষা করতেই হয় তাহলে শক্তি অর্জন করার কোনো বিকল্প নেই।

এই সুরার প্রথমাংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন কিছু বিষয়ের নামে কসম করেছেন যেগুলো ক্ষমতা এবং জিহাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যেমন: আল্লাহ বলেন

> "শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের যেগুলো ক্ষুরের আঘাতে মাটি থেকে স্ফুলিংগ সৃষ্টি করে দেয়। শপথ সেই ঘোড়াগুলোর যারা সকালবেলায় আক্রমন চালায় এবং তাদের রুদ্ধশ্বাস ছুটে চলায় রীতিমতো ধুলিঝড়ের সৃষ্টি হয়। যারা শত্রুবাহিনীর ভেতরেও অবলিলায় ঢুকে পড়ে। নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। (সুরা আল আদিয়াত: আয়াত ১-৬)"

এখানে এমন কিছু দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে যেখানে খুব শক্তিশালী এবং দক্ষ যোদ্ধারা ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। তারা প্রবল ক্ষিপ্রতার সাথে যুদ্ধ করছেন। তাদের ঘোড়াগুলো রুদ্ধশ্বাসে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে সামনে ছুটছে। ঘোড়াগুলো পায়ের ক্ষুর দিয়ে মাটির উপরে এমনভাবে আঘাত করছে যে মাটি থেকে রীতিমতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই এই নির্ভীক ঘোড় সওয়ারীরা সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছে। যারা অবিশ্বাসী তারা সবসময় মিথ্যা এবং প্রতারণাপূর্ণ বিশ্বাসকে সুরক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে। এখানে সেই মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে যখন এই অবিশ্বাসীরাও প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। নিজেদের ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু তখন আর সংশোধন করার সুযোগ তাদের হাতে থাকে না বরং তাদেরকে তখন রক্তের বিনিময়ে সেই ভুলের খেসারত দিতে হয়।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে সঠিকভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য অনেক সময় জিহাদ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক সময় সমাজ থেকে দুর্নীতি এবং অনাচারকে নির্মূল করার জন্য এবং সমাজে ইতিবাচকতা এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করবার জন্য জিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমান সময়ের বাস্তবতা অনেকটা তেমনই। যেভাবে দুর্নীতি এবং অবিচার সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে জিহাদের অপরিহার্যতা আবারও প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সূরায় বলা হয়

> "নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। মানুষ এই বিষয়টা জানে কেননা তার কর্মকান্ড দিয়েই সে এই অকৃতজ্ঞতাকে প্রকাশ করে। (সুরা আদিয়াত: আয়াত ৬-৭)"

সমসাময়িক সভ্যতা পুরোপুরি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর। বর্তমান সময়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে, বা পরকালীন জীবনকে এড়িয়ে আমরা জীবন যাপন করছি। পৃথিবীতে সম্পাদিত প্রতিটি কাজের জন্য আমাদেরকে একসময়

জবাবদিহি করতে হবে- এ অমোঘ সত্যটিকে অস্বীকার করে যেভাবে আমরা জীবন যাপন করছি, মানব ইতিহাসে এরকম কোনো নজির আর দেখা যায় না। এই সূরার শেষাংশে তাই মানবজাতিকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, সম্পদ বিনির্মাণে মানুষের মধ্যে এখন যে উন্মাদনা কাজ করছে প্রকৃতপক্ষে তা মানুষের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

"সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা আবার উঠানো হবে এবং অন্তরে লুকায়িত যে চিন্তা আছে, তার সব কিছুই প্রকাশ করে দেয়া হবে? সেদিন তাদের কি পরিনতি হবে, তোমাদের রব সেই সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন।" (সুরা আল আদিয়াত: আয়াত ৮-১১)

সুরা যিলযাল

(ভুমিকম্প)

কিয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস সংঘটিত হবে বড় এবং প্রলয়ংকারী একটি ভূমিকম্পের মাধ্যমে। সেই ভূমিকম্পে গোটা বিশ্ব জগত ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠবে। ভূমিকম্প নানা মাত্রায় এবং নানা রূপে হতে পারে। কোনো কোনো ভূমিকম্প কয়েক সেকেন্ড আবার কোনোটা হয়তো কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। যতটুকু সময় ধরেই স্থায়ী হোক না কেন, ভূমিকম্পের প্রভাবে সবসময়ই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়। ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়াও সবসময়ই প্রচন্ড পরিমাণে ভীতিকরও হয়।

ভূমিকম্পের প্রভাব অনেক বেশি বিপর্যয়কর হয়ে যায় যদি ভূমিকম্পের পাশাপাশি বিস্ফোরণ এবং আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণও শুরু হয়ে যায়। এই সুরায় ভূমিকম্পের বর্ণনা দিতে গিয়ে সেই চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে,

> "যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে। এবং মানুষ বলবে, এর কী হল ?" (সুরা যিলযাল: আয়াত ১-৩)

মানুষ তখন আরো অসংখ্য প্রশ্ন করতে থাকবে এবং কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন

> "সেদিন পৃথিবী তার যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে তেমনটাই আদেশ করবেন।" (সুরা যিলযাল: আয়াত ৪-৫)

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানবজাতি সেদিন বুঝতে পারবে যে কিয়ামতের সেই ক্ষণ চলে এসেছে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার ও জবাবদিহি করার সময়ও এসে গেছে

> "সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভিন্ন দিকে ছুটে যাবে এবং তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। (সুরা যিলযাল: আয়াত ৬)

সেদিন মানুষের জবাবদিহিতার মাত্রা ও ধরণ হবে নিখুঁত। প্রত্যেকটি অনু পরিমাণ কাজের জন্যেও মানুষকে সেদিন জবাব দিতে হবে। মানুষ তখন ভাববে, আহ! যদি আমি পৃথিবীতে কোনো অপরাধ না করতাম। আমার আমলনামায় যদি কোনো গুনাহ না লেখা থাকতো, তাহলে আমি বেঁচে যেতাম। এ বিষয়টি কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

> "সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও। মানুষ তখন কামনা করবে, যদি সে এসব অপকর্ম থেকে অনেক দূরে থাকতে পারত তাহলে কতই না ভালো হত। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।" (সুরা আলে ইমরান: আয়াত ৩০)

সুরা যিলযাল শেষ হয় অনেক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি আয়াতের মাধ্যমে।

> "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (সুরা যিলযাল: আয়াত ৭-৮)

একবার রাসুল (সা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আমাদের মালিকানায় যে গাধাগুলো আছে তার জন্য আমাদের যাকাত দেয়া উচিত কী? রাসুল (সা.) সেই প্রশ্নের উত্তরে সুরা যিলযালের ৭ নম্বর আয়াতটি পাঠ করেছিলেন। কেননা এই প্রশ্নের উত্তরে এটাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত ও গ্রহনযোগ্য জবাব।

সুরা আল-বাইয়্যেনাহ

(প্রমাণ)

এই সুরায় গোটা পৃথিবীর ইতিহাসকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দী জুড়ে পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। অন্যদিকে চীন এবং ভারতে পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজারীদের আধিপত্য ছিল। এসব অঞ্চলে তখন বহু ঈশ্বরের অনুসরণ করা হতো।

সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে, বিশেষ করে ইসলামের পুনরায় আবির্ভাবের পর বিশ্ব মানচিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। উত্তর আফ্রিকা, নীলনদ তীরবর্তী এলাকা, আনাতোলিয়া এবং মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের বিশাল এলাকা ইসলামের আওতায় চলে আসে।

যারা সত্যিকারের খ্রিষ্টান ছিলেন তাদের অনেকেই ইসলামকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং স্বেচ্ছায় ইসলামকে বরণও করে নিয়েছিলেন। তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, নবি মুহাম্মদ (সা.) তাদের পবিত্র গ্রন্থ ইঞ্জিলে (বাইবেল) বর্ণিত আল্লাহ নির্ধারিত মিশনের পরিসমাপ্তি হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন। কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> "যারা এর পূর্ব থেকে এলেম বা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে কুরআনের তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলেঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরো বৃদ্ধি পায়।" (সুরা বনী ইসরাইল: আয়াত ১০৭-১০৯)

অন্য আরেক সূরায় আল্লাহ বলেন,

> "যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার জন্যে আনন্দিত হয়। আবার এমনও কিছু দল আছে যারা এই কিতাবের কোনো কোনো বিষয় অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরকম আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।" (সুরা আর রাদ: আয়াত ৩৬)

আল্লাহ আরও বলেন

> "এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবর্তীণ করেছি। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এমনকি এই আরবদেরও কেউ কেউ এই কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।" (সুরা আন কাবুত: আয়াত ৪৭)

এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে ইসলাম খুব দ্রুত এবং সহজভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামের এই সফলতার নেপথ্যে অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ ছিল। এই পরিসরে আমি তা আলোচনা করতে চাইছি না। তবে এটা বলতে চাই যে, খ্রিষ্টান ছাড়াও অসংখ্য বৌদ্ধ এবং পৌত্তলিকরাও তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

কেন ভিন্ন ধর্মের এত সংখ্যক মানুষ ইসলামকে আপন করে নিল? প্রকৃত সত্য হলো, কুরআনের ক্ষমতা এবং ক্যারিশমা দেখেই এই বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামের ভক্ত হয়ে উঠেছিল।

> "আহলে-কিতাব (খৃষ্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়) ও মুশরিকদের (পৌত্তলিক) মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা ইসলামের পথে কখনোই ফিরে আসত না যদি তাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা না হতো। অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি তাদের সামনে এমন কিছু বিশুদ্ধ আয়াত তেলাওয়াত করতেন যা ভীষণ রকম প্রাসংগিক ও বস্তুনিষ্ঠ।" (সুরা আল বাইয়্যেনাহ: আয়াত ১-৩)

কুরআনে যে নীতিমালা এবং বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে তা কোনো একটি সময়ের অধীনে গন্ডিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। বরং যেকোনো ধরনের পরিস্থিতির সাথে কুরআনের মর্মবাণী প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রযোজ্য। যদি সত্যিকার অর্থে এবং একনিষ্ঠভাবে আল কুরআনকে ধারণ করা হয়, তাহলে আল কুরআন দিয়েই যেকোনো সময়, যেকোনো সমস্যার সমাধান করা যায়। মানুষের স্বভাবই এমন যে, মানুষ সত্যকে বুঝতে পারে এবং স্বীকৃতিও দেয় অথচ এরপর আবার তারা সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশী মত কাজও করে যায়।

এর আগে পূর্ববর্তী যেসব জাতির উপর আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকে ঐশ্বরিক বাণীকে অগ্রাহ্য করেছিল। এমনকি কেউ কেউ আল্লাহর নবী ও রাসূলদেরকে হত্যা করারও উদ্যোগ নিয়েছিল। তাছাড়া, ঐ ধরনের খোদাদ্রোহী মানুষগুলো এতটাই বেপরোয়া ছিল যে, তারা আল্লাহর বিধানের অনুসারীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন পরিচালনা করতেও দ্বিধা করত না। এই সূরায় তাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> "পূর্ববর্তী কিতাব প্রাপ্তরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট কিতাব আসার পরেও বিভ্রান্ত হয়েছে। অথচ তাদেরকে কেবল এটুকুই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।" (সুরা আল বাইয়্যেনাহ: আয়াত ৪-৫)

জ্ঞান থাকলেই একজন মানুষ ন্যায়নিষ্ঠ এবং আমলদার হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বুদ্ধিবৃত্তিক ভুল কিংবা সত্যকে অস্বীকার করার অপরাধকে হয়তো বা ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিংবা এ ধরনের অপরাধ থেকে হয়তো পরিত্রানও পাওয়া যাবে। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ কাজকে প্ররোচনা দেয়, আল্লাহর নাফরমানিকে উৎসাহিত করে এবং বার বার আত্মাকে কলুষিত করার চেষ্টা করে তাহলে তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

এই সূরায় নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোভী, স্বার্থপর এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি ধর্মকে হেয় করে এবং ধর্মকে অপব্যবহার করে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

> "আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" (সুরা আল বাইয়্যেনাহ: আয়াত ৬)

মানুষের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই ন্যায় বিচার করবেন এতে কোন সন্দেহ নাই। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যেমন নেয়ামত দিতে পারেন তেমনি ইচ্ছামত কাউকে আবার নেয়ামত থেকে বঞ্চিতও করতে পারেন। আল্লাহ যার উপরে অসন্তুষ্ট হন তার ক্ষমা পাওয়ার আর কোনো উপায় থাকার কথা নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হলেন গাফুরুর রাহিম, পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল এবং তিনি উদারতার আঁধার। তাই যারা নিজেদের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করতে চায় না এবং যারা পাপ থেকে মুক্তি পেতে চায় তাদের জন্য আল্লাহ সব সময় দরজা উন্মুক্ত করে রেখেছেন।

এই সূরার শেষাংশে আল্লাহ তাআলা সমস্ত বিবেকবান এবং ঈমানদার ব্যক্তিদের আবারও পুরস্কার দেয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। বিশেষ করে সেই সব সচেতন ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার পাবেন যারা সব সময় সতর্ক থাকেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষাকে ধারণ করে জীবন যাপন করেন। এই বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

> "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান নির্ধারিত রয়েছে। তাদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ আছে এমনই এক জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এই পুরস্কার তাদের জন্যে, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে।" (সুরা আল বাইয়্যেনাহ: আয়াত ৭-৮)

প্রথম যুগে যেসব মুসলমানেরা যারা ইসলামের সুমহান বার্তা ধারণ ও বহন করতেন তারা ছিলেন কুরআনের আদর্শ অনুসরণকারী। তারা যেখানেই যেতেন সেখানেই তারা ন্যায় বিচার, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, এবং মানবিক মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্বল, ভাগ্যপীড়িত, বঞ্চিত এবং নির্যাতিত মানুষগুলো তাই স্বাভাবিকভাবেই ইসলামকে ত্রাণকর্তারূপে গণ্য করেছিল। তারা নিশ্চিত হতে পেরেছিল যে, মানুষ হিসেবে তাদের যে আত্মমর্যাদা ও সম্মান রয়েছে কেবলমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই রক্ষা করা সম্ভব। আর এই বিশ্বাস থেকেই দল মত নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ তখন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল।

সুরা আল কদর

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা ঐশ্বরিক বার্তাসমূহ যে রাতে নাযিল হওয়া শুরু হয় তাই লাইলাতুল কদর নামে পরিচিত। এই রাতটি মহিমান্বিত এবং গৌরবোজ্জ্বল। লাইলাতুল কদরের সঠিক তারিখটির ব্যাপারে একমত হওয়া যায় না। কিন্তু মুসলিম ক্যালেন্ডারের নবম মাস অর্থাৎ রামাদান মাসের শেষ দশ দিনের কোন এক বেজোড় রাতেই এই পবিত্র রজনীটি রয়েছে। যেহেতু আমরা চন্দ্র মাস অনুযায়ী হিসেব করি আর নতুন একটি চাঁদের আবির্ভাবকেই নতুন একটি মাসের সূচনা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়; সেই হিসেবে বছরজুড়েই চন্দ্র মাস সূচনার বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে লাইলাতুল কদর প্রকৃতপক্ষে কোন রাতে পড়ছে, তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। মুসলমানরা এই পবিত্র রজনীতে অনেক বেশি নফল ইবাদত করতে আগ্রহী থাকে কেননা রোজাদারদেরকে রামাদান মাসের শেষার্ধে বেশি বেশি ইবাদত করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

নিঃসন্দেহে কুরআন নাযিল হওয়ার সূচনার পবিত্র ক্ষণটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। আর তাই এই পবিত্র মুহূর্তটি বেশি বেশি নামাজ, দোয়া এবং একনিষ্ঠ ইবাদতের মধ্য দিয়ে পার করা উচিত। আল কুরআন হলো আল্লাহ তাআলার নিজস্ব বক্তব্য- যা মানবতার জন্য সর্বশেষ ঐশ্বরিক বার্তা হিসেবে নাযিল হয়েছে। আল কুরআন পৃথিবীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই প্রসঙ্গে বলেন,

> "আমি আল কুরআনকে নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। লাইলাতুল কদর সমন্ধে আপনি কী জানেন? এই রাতটি হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই রাতেই প্রত্যেক কাজের জন্যে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ ও রূহ তাদের রবের আদেশক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়।" (সুরা আল কদর: আয়াত ১-৪)

কুরআনের অন্যত্র লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন

> "এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় এবং প্রত্যেক সৃষ্টির নিয়তি নির্ধারিত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে তা নির্ধারিত হয় এবং আমিই এর প্রেরণকারী। আর এই সবই আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ।" (সুরা আদ দুখান: আয়াত ৪-৬)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন এমনই এক ঐশ্বরিক গ্রন্থ যেখানে মানব জীবন ও মানবিক চরিত্রকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল নিয়ম নীতি বিধি-বিধান শিক্ষা এবং নির্দেশনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আল কুরআন হল মানুষের যাবতীয় উৎসাহ এবং প্রকৃত নির্দেশনার একমাত্র উৎস। অন্যান্য যে সব গ্রন্থকে ঐশ্বরিক হিসেবে দাবি করা হয় সেগুলোর সাথে আল কুরআনকে তুলনা করলেই আল কুরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো নিরূপণ করা যায়।

এই রাতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল শুরু করেছিল বলে এই রাতে আল্লাহ নিরাপত্তা ও শান্ত পরিবেশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন

> "এই রাতটি নিরাপত্তা ও শান্তির, যা ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।" (সুরা আল কদর: আয়াত ৫)

পৃথিবীতে ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো জমিনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা। তবে শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত হবে যখন পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

সূরা আল আলাক

(জমাট বাঁধা রক্ত)

নবুওয়াত পাওয়ার আগে রাসুল (সা.) মক্কা নগরীর নিকটবর্তী হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় সময় কাটাতেন। মূলত, মক্কার মানুষদের অসদাচরণ এবং অন্যায় অত্যাচার দেখে রীতিমতো বিরক্ত ও নিরাশ হয়েই তিনি হেরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আরবেরা তখন যেসব মাটি ও পাথরে তৈরি মূর্তির উপাসনা করত তিনি তাও মানতে পারছিলেন না। আরবদের ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক ধর্মীয় কর্মকান্ডও তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তবে তার কাছে তখনও পর্যন্ত বিকল্প কোনো সমাধানও ছিল না।

এরকম একটি অবস্থায় একদিন তিনি হেরা গুহায় ধ্যান করছেন। ঠিক এরকম সময়, অপরিচিত একটি কণ্ঠ ভেসে এলো। সেই কণ্ঠস্বর তাকে বলল, আপনি পড়ুন। কিন্তু নবীজি (সা.) বুঝতে পারছিলেন না যে তাকে ঠিক কী পড়তে বলা হচ্ছে। তাই তাকে বলা হল,

> "পড়ুন, আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সুরা আল আলাক: আয়াত ১-৫)

এই হল রাসুল (সাঃ) এর উপর নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা মানুষকে জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে সৃষ্টি করতে পারেন; তাই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সবচেয়ে বেশি ভাববেন- এটাই স্বাভাবিক। এ কারণে, সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী প্রভু তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মিশনের পরিসমাপ্তি টানার জন্য একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদের (সা.) নবি হওয়ার কোনো স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাই ওহী নাযিলের সময় যে ঘটনাগুলো ঘটলো তা দেখে প্রাথমিকভাবে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। তবে যে মুহূর্তে তিনি তার দায়িত্বটি উপলব্ধি করতে পারলেন তখন থেকেই তিনি সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য এবং তার আশপাশের মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিলেন। তিনি সেভাবেই মুসলিম উম্মাহকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন যেভাবে ইতোপূর্বে তার পূর্বসূরী নবী হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত মুসা (আ.) প্রয়াস চালিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদের (সা.) জীবন ও কর্মকে যদি নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে বলতেই হবে, তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে সর্বোচ্চ উৎকৃষ্ট মানে সুসম্পন্ন করতে পেরেছেন। পৃথিবীতে আজ অবধি যত মানুষ এসেছে নি:সন্দেহে তিনি তার মধ্যে সর্বাধিক যোগ্য এবং কল্যানকামী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে যে আয়াতগুলো নবি মুহাম্মদ (সা.) এর উপর নাযিল হল তাহলো,

> "বস্তুত মানুষ সীমালংঘন করে। মানুষ এমনটা করে কেননা মানুষ নিজেকে সাবলম্বী ও মুখাপেক্ষীহীন মনে করে। অথচ, নিশ্চিতভাবেই মানুষকে আপনার পালনকর্তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।" (সুরা আলাক: আয়াত ৬-৮)

দারিদ্রতার কারণে মানুষ বঞ্চনা এবং অবজ্ঞার শিকার হয়। অন্যদিকে, সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে মানুষ বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করে। তাই মধ্যম পন্থা এবং ভারসাম্য বজায় রাখাই উত্তম। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাদের সম্পদ বেশি হয়ে যায় তারা অন্যকে অবজ্ঞা করে, হেয় করে এবং নিজেরা দম্ভে আর অহংকারে ডুবে যায়। নিজেদের জবাবদিহিতার ব্যাপারে তারা আর তোয়াক্কা করে না এবং পরকাল নিয়েও তাদের মধ্যে আর কোনো ভয় কাজ করে না।

এই সুরায় সেই সব অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের সমালোচনা করা হয়েছে যারা খোদার ওহীকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে অবহেলা ও অসম্মান করেছে। আল্লাহ বলেন,

> "আপনি কী সেই মানুষগুলোকে দেখেছেন, যারা নেক বান্দার নামাজ, অন্যন্য ইবাদতে বাঁধা দেয়? আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে। অথবা খোদাভীতি শিক্ষা দেয়।" (সুরা আলাক: আয়াত ৯-১২)

আল কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

> "(তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে) তোমরা কী অন্যায় করেছো যা তোমাদেরকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে এসেছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার দিতাম না,আমরা সমালোচকদের সাথে মিলে সমালোচনা করতাম। এবং আমরা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করতাম।" (সুরা আল মুদাসসির: আয়াত ৪২-৪৬)

দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কার বাসিন্দাদের সাথে নবী মুহাম্মদের (সা.) যে সংগ্রাম এবং ভিন্ন অবস্থান তার মূল কারণ হল রাসুল (সা.) তাদেরকে নামাজ পড়তে বলেছিলেন এবং যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়াালার অস্তিত্ব এবং সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আহবান করেছিলেন। আল্লাহর অস্তিত্ব আর সার্বভৌমত্বই হলো মুসলিম এবং মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান চিরন্তন দ্বন্দ্বের মূল কারণ। আর এক্ষেত্রে মুসলমানদের আপোষ বা সমঝোতা করার কোন সুযোগ নাই।

এ কারণেই এই সূরায় বলিষ্ঠ উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

> "আপনি কি দেখেছেন, কিভাবে অবিশ্বাসীরা মিথ্যারোপ করে এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কী জানে না যে, আল্লাহ সব দেখছেন?" (সুরা আল আলাক: আয়াত ১৩-১৪)

যারা মুসলমানদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি করছে; যারা জীবনকে দায়িত্ব ও দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে বিবেচনা করার পরও সামান্য একজন মানুষকে নিজের মনিব হিসেবে মেনে নিয়ে তাকেই খুশি করতে ব্যস্ত থাকে। কিংবা যেসব মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় নেই, তাদেরও এই আয়াতটি পড়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ সব দেখছেন, এটা এখন অনেক মুসলমানও যেন ভুলে যাচ্ছেন।

পরিশেষে, এই সুরায় অবিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গকে সতর্ক করে বলা হয়েছে,

> "যদি অবিশ্বাসীরা এসব অনাচার থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মাথার সামনের চুলগুলোকে ধরে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। অতএব, সে যদি এই আজাব থেকে বাঁচতে চায় তাহলে সে

তার সব সঙ্গী সাথীদেরকে ডেকে পাঠাক। আমিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে ডাকছি।" (সুরা আলাক: আয়াত ১৫-১৮)

আর সবশেষে আল্লাহ রাসুলকে (সা.) হতাশ না হতে বলেছেন। যে কোনো প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও বার বার রবের সামনে সিজদায় নত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

"কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।" (সুরা আল আলাক: আয়াত ১৯)

সূরা আত তীন

(ডুমুর)

> "শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের, এবং এই নিরাপদ মক্কা নগরীর। আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।" (সুরা তীন: আয়াত ১-৪)

এই সুরাটি শুরু হয়েছে একটি নিশ্চয়তা দিয়ে আর তাহলো ডুমুর এবং জয়তুন গাছ যেমন সত্য ও বাস্তব। সিনাই পর্বতের অস্তিত্ব যেমন বাস্তব, আবার মক্কা নগরী একটি শান্তি ও নিরাপত্তার শহর এটা যেমন বাস্তব ও সত্য কথা ঠিক একইরকম আরেকটি সত্য হলো যে, মানুষকে অত্যন্ত চমৎকার একটি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামোতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

নানা ধরনের গাছপালা যেমন ডুমুর গাছ কিংবা জয়তুন গাছ এগুলো সবই প্রকৃতির একেকটি উপকরণ যা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্বকে প্রমান ও প্রতিষ্ঠা করে। কেননা, একেবারেই কাঁদা, নরম কিংবা শক্ত মাটি থেকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সবচেয়ে মিষ্টি, বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ফল এবং সুগন্ধময় ফুলগুলো উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কোনো কোনো মুফাসসির অবশ্য এই মতামত দিয়েছেন যে ডুমুর, জয়তুন, সিনাই পর্বত কিংবা মক্কা মূলত সেইসব অঞ্চলকে নির্দেশ করে যে সমস্ত স্থান আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নবি ও রাসূলের স্মৃতি বিজড়িত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী, ভয়াবহ প্লাবন শেষে হযরত নুহ (আ.) জুদি পাহাড়ের ওপর যে মসজিদটি নির্মান করেন এখানে তীন বা ডুমুর দিয়ে সেই মসজিদকেই বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে, জয়তুন হলো জেরুজালেমের নিদর্শন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) মক্কায় কাবা ঘর নির্মাণ করে যখন জেরুজালেমে ফিরে যান তখন সেখানে তিনি এই গাছটি সেখানে রোপণ করেছিলেন। এখনো অবধি, তীন ও জয়তুন গাছদুটো ফিলিস্তিন ও সিরিয়া অঞ্চলেই বেশি হয়। সিনাই পর্বত হলো সেই পবিত্র স্থান যেখানে হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা এই পর্বতের উপরই হযরত মুসাকে (আ.) নবুওয়াতও দান করেছিলেন। আর মক্কা হল শান্তির নগরী ইসলামের কেন্দ্রস্থল। হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কায় যখন স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে আল্লাহ'র হুকুমে জেরুজালেমে ফিরে যান, তখন তিনি এই মক্কা নগরীকে পবিত্র ও শান্তিময় রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন।

এইসব চমৎকার এবং মহোৎসব বৈশিষ্ট্য সম্বলিত স্থানসমূহ একটি চিরন্তন সত্যকেই সাক্ষ্য দেয় আর তা হলো, মানুষকে অতি উত্তম অবয়ব ও আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধুমাত্র শারীরিকভাবে নয় বরং মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবেও মানুষের কাঠামো অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। মানুষের বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা এবং সচেতনতা তাকে অন্য সব সৃষ্টি থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

অধিকন্তু রাসুল (সা.) বলেছেন,

> "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" [বুখারি ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযি ১১৩৪, ১৯৮৮)

আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে চেতনা দিয়েছেন তা মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। মানুষ প্রাথমিকভাবে ইতিবাচক সৃষ্টিকুলের মধ্যে সামান্য একটি উপকরণ হলেও পরিবেশ মানুষকে ক্রমাগত দুর্নীতিগ্রস্ত ও চরিত্রহীন করে দেয়। ফলে, সে তার ইতিবাচক গুনাবলী ও মানবিক ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> "তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সুরা আর রুম: আয়াত ৩০)

যখন মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান হারিয়ে ফেলে এবং তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়, তখন তাদের মধ্যে নানা ধরনের খারাপ আচরণ দেখা দেয়। মানুষ তখন শিশু হত্যা, স্বামীর সাথে সাথে জীবন্ত স্ত্রীকে দাফনসহ নানা ধরনের বর্বর কাজগুলো করতে শুরু করে। সেই সাথে, অন্যের ওপরও অত্যাচার, নির্যাতন, জুলুম শুরু করে। মানুষের মধ্যে লোভ ও ধর্মহীনতা সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করে।

মানুষের ভেতরে আল্লাহ তাআলা যে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়েছেন যদি তাকে সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস বাড়াতে হবে। তাকওয়াকে মজবুত করতে হবে। আল্লাহ'র প্রতি ভয় বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে বিপথগামী মানুষদের প্ররোচনায় ভালো মানুষেরও পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এই সুরায় তাই বলা হচ্ছে

> "অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার।" (সুরা তীন: আয়াত ৫-৬)

এর পরপরই মানুষের সামনে একটি কঠিন এবং অর্থবোধক প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে।

> "এত কিছুর পরও কেন তুমি কিয়ামতকে অবিশ্বাস করছ? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?" (সুরা তীন: আয়াত ৭-৮)

এই আয়াতগুলো আমাদের সামনে এই প্রশ্নই রাখছে, কেন সত্য পথ দেখানোর পরেও একজন মানুষ ভুল পথে চলে যায় আবার অন্যকেও বিপথগামী করার চেষ্টা করে? কিভাবে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সঠিক পথের পরিবর্তে একটি বাতিলপন্থী পথকে বেছে নেয়?

তিরমিজি শরীফের একটি হাদীসে জানা যায় রাসুল (সা.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন যখনই কেউ এই সুরার শেষ আয়াতটি অর্থাৎ 'আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক নন'? পড়বে তখন বলবে, "বালা আনা আলা যা-লিকা মিনাশ শাহিদীন' অর্থাৎ হ্যাঁ আমিও এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি। যদিও অনেক মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে দুর্বল বলে গন্য করেছেন।

সূরা আল ইনশিরাহ

সান্তনা

এই সুরাটি পূর্ববর্তী সুরা অর্থাৎ সুরা আদ দোহার ধারাবাহিকতা বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা, এই সুরায় অনেকটা একই স্টাইলে, একই ভঙ্গিতে অনেকগুলো প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা রাসুলকে (সা.) যে জ্ঞান এবং মর্যাদা দান করেছেন তার ফলেই নবিজির (সা.) অন্তর বিকশিত হয়েছে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিও অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।" (সুরা আন নিসা: আয়াত ১১৩)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন একটি সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা ছিল অন্ধকার এবং অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। সেই সময়, গোটা পৃথিবী কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অকার্যকর পদ্ধতি আর বানোয়াট কয়েকটি ধর্মের বেড়াজালে আটকে পড়েছিল। এই পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে রাসুলের (সা.) সীমাহীন কষ্ট এবং যন্ত্রনাও ভোগ করতে হচ্ছিল। চারপাশের লোকজন থেকে নবিজি (সা.) যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা এবং সমর্থনও পাননি। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বরাবরই তাঁর পাশে ছিলেন এবং তিনিই নবিজিকে (সা.) চলার পথে নিরন্তর দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেছেন

> "আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি (অন্তরে স্বস্তি দেইনি)? আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি, যা আপনার জন্য রীতিমতো অসহনীয় ছিল।" (সুরা আল ইনশিরাহ: আয়াত ১-৩)

রাসুলের (সা.) দাওয়াতি কার্যক্রমের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল তাওহীদ। এই তাওহীদ খুবই স্পষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত একটি চেতনা যা সব ধরনের গোঁড়ামি এবং কলুষিত মতবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত। রাসূলের (সা.) রিসালাতের বার্তা বিশ্বের সর্বজনীন বার্তারই পরিপূরক।

সর্বকালের সকল যুগে যত নবি ও রাসূল এসেছিলেন সবাই এই একই বার্তা বহন করেছিলেন। আর এই সার্বজনীন কল্যানমুখী তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করার কারণে আমাদের প্রিয় রাসূলের (সা.) মর্যাদাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাই বলেন,

> "আমি আপনার আলোচনাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছি।" (সুরা আল ইনশিরাহ: আয়াত ৪)

নিজের জীবনেও রাসূল (সা.) তাওহিদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোকে সফলতার সাথে অনুশীলন করেছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী অনেকেই নবিজীকে ছদ্মবেশি জাদুকর বলে মনে করে। চৌদ্দশ বছর আগে আরবেরাও নবিজি (সা.) সমন্ধে এরকমই ধারণা করত। মূলত, তাদের মধ্যে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয় কেননা, তাওহীদ তথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের ধারণাকেই তারা অস্বীকার করে। তারা মনে করে পৃথিবী আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজের মতো করেই এখনো টিকে আছে। তাই তারা এও মনে করে যে, মানুষের জীবনও নিজের খেয়াল খুশি মতো কাটানো যাবে।

অথচ বাস্তবতা হল, যদি কেউ তার রবের ব্যাপারেই ভিত্তিহীন দাবি তুলতে পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের বিরুদ্ধেও মিথ্যা অভিযোগ তুলতে তারা কোনো দ্বিধাবোধ করবে না। আল কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

> "আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। জালেমরা শুধুমাত্র আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলীকেও অস্বীকার করে।" (সুরা আল আনআম: আয়াত ৩৩)

এই সূরায় আল্লাহতাআলা নবীজীকে (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যাতে তিনি এই ধরনের নাফরমানদের মোকাবেলায় ধৈর্যশীল ও সংবেদনশীল থাকতে পারেন। তারা যতই সমালোচনা করুক না কেন, যতই মিথ্যা অপবাদ দিক না কেন, তার মোকাবেলায় আল্লাহ তাআলা নবিজিকে (সা.) শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ নবিজি (সা.) এবং সাহাবীদেরকে সান্তনাও প্রদান করেছেন।

> "নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।" (সুরা ইনশিরাহ: আয়াত ৫-৬)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন কঠিন সময়ের বার্তা দেয়া হয়েছে অন্যদিকে আবার অনেক বেশি স্বস্তির ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। এই সূরার শেষাংশে মমিন বান্দাদেরকে আল্লাহর পথে আরও বেশি পরিশ্রম করা এবং আল্লাহর প্রতি আরো মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

> "অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।" (সুরা ইনশিরাহ: আয়াত ৭-৮)

ইসলাম হলো এমন একটি জীবন দর্শন যেখানে সততা, সত্য এবং ন্যায় বিচারকে ধারণ করা হয়। এই মানবিক গুণাবলীগুলোই আজকের সময় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মূর্খতা, খামখেয়ালিপনা এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাতামাতি এখন মাত্রাতিরিক্ত পরিমানে বেড়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে ন্যায় বিচার এবং সত্যের অনুশীলন ও চর্চা ধামাচাপা পড়ে গেছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, আল্লাহ তাআলা এই সুরায় মধ্য দিয়ে নবিজির (সা.) অনুসারীদেরকে যে বার্তা দিয়েছেন তা খুবই স্পষ্ট এবং কার্যকর।

সুরা আদ দোহা

(পূর্বাশার আলো)

পবিত্র কুরআনকে অনেক সময় নুর বা আলো হিসেবে অভিহিত করা হয়। আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন

> "অতএব তোমরা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং অবতীর্ন নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সব জানেন।" (সুরা তাগাবুন: আয়াত ৮)

আল কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন,

> "কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি।" (সুরা আস শুরা: আয়াত ৫২)

কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুলে করিমের (সা.) জন্য আল কুরআন ছিল একটি আলোকবর্তিকা এবং তিনি যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন ততদিন তিনি কুরআনকেই একমাত্র পাথেয় হিসেবে অনুসরণ করে গেছেন। প্রথম দিকে যখন ওহী নাযিল হতো তখন মাঝে মাঝে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকদিন বিরতি পড়ে যেত। এরকম বিরতি হলেই রাসুল (সা.) ভাবতেন, আল্লাহ বোধহয় তার উপর কোনো কারনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তাই তিনি ওহী নাযিল করছেন না। এরকমই একটি মুহূর্তে সুরা আদ দোহা নাযিল হয়। এই সুরার মাধ্যমে নবি মুহাম্মদকে (সা.) নিশ্চিন্ত করা হয়।

> "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং আপনার প্রতি অসুন্তষ্টও হননি।" (সুরা আদ দোহা: আয়াত ১-৩)

মুফাসসিরগন মনে করেন, তৎকালীন সময়ে কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছুটা সময় মাঝে বিরতি দেওয়া হতো যাতে ওহীর বাণীগুলোকে মুখস্থ করা যায় এবং এই আয়াতগুলোর চেতনা বাস্তবে ধারণ করাও সম্ভব হয়। ওহী নাযিলের ক্ষেত্রে বিরতিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি মনে করার কোন সুযোগ নাই। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করে আরো বলেছেন,

> "আপনার ইহকালের চেয়ে পরকাল বেশি উত্তম।" (সুরা আদ দোহা: আয়াত ৪)

রাসুল (সা.) খুব কম সংখ্যক সঙ্গী সাথী নিয়ে ইসলামের দাওয়াতি কাজ শুরু করেছিলেন। তবে খুব অল্প সময়ে, বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এই বিশাল সংখ্যক মুসলমানের সত্য পথে আসার প্রেক্ষিতে নতুন একটি সভ্যতার সূচনা হয়। মুসলমানদের এই কৃষ্টি, কালচার এবং সভ্যতা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ। প্রথম দিকে, রাসুলের (সা.) উপর নিয়মিতভাবে ওহী নাযিল হতো। সেই সময়ে, রাসুল (সা.) অনেক বেশি পরিশ্রম করতেন কেননা তাকে প্রচলিত ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে একটি নতুন ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করতে হয়েছিল।

নবিজির (সা.) ওপরে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল যা আজও অক্ষত অবস্থায় আমাদের সামনে আছে এবং আমরা যেকোনো সময়, যেকোনো প্রয়োজনে কুরআনের শরণাপন্ন হতে পারি। আল কুরআনই হলো ইসলামের সৌন্দর্য এবং ব্যাপকতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পরবর্তীতে আল্লাহ জানিয়েছেন,

> "আপনার পালনকর্তা খুব জলদি আপনাকে এত বেশি নেয়ামত দান করবেন, যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (সুরা আদ দোহা: আয়াত নং ৫)

ফলে, কোনো কারণেই নবি মুহাম্মাদের (সা.) হতাশ হওয়ার সুযোগ নেই। ইসলামের সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগে রাসুলের (সা.) ওফাত হয় এবং তাকে মদিনায় তার প্রিয় মসজিদের একদম সন্নিকটে দাফন করা হয়। রাসুল (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার কাছে দুনিয়াবি কোনো সম্পত্তি বা সম্পদ ছিল না। রাসুলের (সা.) ওফাতের পর থেকেই তার উত্তরসূরিরা নবিজির (সা.) ইসলামের পতাকাকে বহন করে নিয়ে এসেছেন এবং অধ্যবসায় ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আল্লাহ তাআলা উত্তম মানুষগুলোর মধ্যে থেকেই তাঁর নবি ও রাসূলকে বাছাই করে নেন। এরপরে, আল্লাহ তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নানা ধরনের কঠিন ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে তাদেরকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেন যাতে তারা চরিত্র, আচার-আচরণ এবং কার্যক্রমে অন্য সকলের জন্য অনুকরণীয় হয়ে উঠতে পারে। এর আগে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.) কে বলেছিলেন,

> "আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনেই বেড়ে ওঠো/বিকশিত হও।" (সুরা ত্বোয়াহা: আয়াত ৩৯)

একইভাবে, নবি মুহাম্মদকে (সা.) উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

> "আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আপনার রবের দৃষ্টির সামনেই আছেন। যখুনি আপনি দাঁড়াবেন তখন আপনার পালনকর্তার প্রশংসাময় পবিত্রতা ঘোষণা করুন। আর রাতের বেলায় আর তারাগুলো নিভে যাওয়ার সময়ও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।" (সুরা আত তূর: আয়াত ৪৮-৪৯)

এই সূরাতেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন

> "তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।" (সুরা আদ দোহা: আয়াত ৬-৮)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বা অন্য কোন নবির অবহেলিত বা অবিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ সুযোগ নেই যদিও প্রাচীন কিছু লেখায় এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বরং এটাই সত্যি কথা যে, নবি-রাসূলেরা সবসময়ই সঠিক পথে থাকার জন্য হেদায়েত প্রাপ্ত হতেন। তারা যোগ্যতর নেতা হিসেবে নিজেদের জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাদেরকে হেদায়াতের উপর থাকতে সাহায্য করেছেন।

স্বস্তির সাথে জীবন যাপন করার জন্য যতটুকু লাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তা নবি মুহাম্মদকে (সা.) দিয়েছিলেন। তবে রাসূলে করীম (সা.) কোনো ধনী শাসক ছিলেন না। রাসুলের (সা.) প্রতি আল্লাহ যে রহম করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ আরো বলেন,

> "সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; কেউ প্রশ্ন করলে তাকে ধমক দেবেন না। আর সবসময় আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।" (সুরা আদ দোহা: আয়াত ৯-১১)

পবিত্র কোরআনের অন্য একটি স্থানে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদকে (সা.) নির্দেশনা প্রদান করেন যে,

> "অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি জাদুকরও নন আবার মানসিক বিকারগ্রস্তও নন।" (সুরা আত তুর: আয়াত ২৯)

আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদকে (সা.) বেছে নিয়েছিলেন, ইসলামের মর্মবাণীকে সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। যাতে মানুষকে বিপথগামী হওয়া থেকে হেফাজত করা যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন ,

> "তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন।" (সুরা হুদ: আয়াত ১২)

সূরা আল লাইল

(রাত্রি)

> "শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।" (সুরা আল লাইল: আয়াত ১-৩)

দিন এবং রাতের আগমন প্রতিদিনের একটি নিয়মিত চক্রাকার ঘটনা। দিন এবং রাত- এই দুই ধরনের সময়ে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করে। এই সময়গুলোতে মানুষ নানা ধরনের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করে এবং নিজেদের জীবনের ভবিষ্যত কাঠামোও বিনির্মাণ করে।

> "নিশ্চয়ই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (সুরা আল লাইল: আয়াত ৪)

নিত্য নৈমত্তিক কাজের পাশাপাশি মানুষ অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবনকে সুন্দর করার জন্যও মানুষ প্রচেষ্টা চালায়। সেই চিরস্থায়ী জীবনে কেউ থাকবে জান্নাতে আবার কেউ বা জাহান্নামে। প্রতিটা মানুষের গন্তব্য এবং ঠিকানা নির্ধারিত হবে তার আমলের ভিত্তিতে। প্রত্যেকের নেক আমল তার জন্য সুখ, স্বাচ্ছন্দ এবং সফলতা নিয়ে আসবে আর খারাপ কাজগুলো তার জন্য আনবে দুর্দশা, বিপর্যয় এবং ধ্বংস।

এই সূরায় আল্লাহ ইরশাদ করেন,

> "অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়,এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে,আমি তার জন্য সুখ ও কল্যান পাওয়ার পথকে সহজ করে দেবো। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে,আমি তার জন্য কষ্ট ও বিপর্যয়ের পথকে সহজ করে দেবো। যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনোই কাজে আসবে না। আমার দায়িত্ব পথ প্রদর্শন করা। আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সুরা আল লাইল: আয়াত ৫-১৬)

একটা সময় এমন ছিল, মুসলমানরা তাদের অমিত সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। তাই তারা একটু ধীরে এবং অলসভাবে চলতে চাইত। এভাবে চলতে গিয়ে অজান্তেই তারা নিজেদের ভবিষ্যতকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই বোকার মত আচরণ করত এবং আল্লাহ নির্দেশনাগুলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতেও তারা পারছিল না; বরং নানা ধরনের জটিলতা এবং কুসংস্কারেই তারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছিল।

উদারতা, সততা এবং তাকওয়া মুসলমানদেরকে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হতে সাহায্য করে। আর উপরোক্ত সংকটগুলো থেকে শুধুমাত্র খোদাভিরু ও তাকওয়াবান ব্যক্তিরাই বিরত থাকতে পারে।

> "প্রজ্বলিত আগুন থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে।" (সুরা আল লাইল: আয়াত ১৭)

এগুলো অর্জন করা সহজ নয়। অধিকাংশ মানুষ সম্পদ, ক্ষমতা এবং খ্যাতি পাওয়ার জন্য বেসামাল থাকে। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্যই তারা ব্যতিব্যস্ত থাকেন। আমরা কমবেশি সবাই এই দুনিয়াবী ফায়দা ও প্রতিপত্তি অর্জনের জন্যই ব্যস্ত হয়ে আছি। সততা এখন রীতিমতো একটা দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এই কঠিন বাস্তবতাকে সামনে রেখে এ সূরায় বলা হয়েছে,

> "যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে। এবং তার মনে কারও জন্য যদি এমন কোনো আনুকল্য বা একপেশেভাব থাকে না, যার বিনিময়ে আবার তার স্বার্থ হাসিল হতে পারে। এবং যে সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। তারা খুব জলদি মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ করবে।" (সুরা আল লাইল: আয়াত ১৮-২১)

যারা দুদিনের এই দুনিয়াকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকে, তাদের অন্তর থেকে টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য পার্থিব সম্পদের মোহকে ধুয়ে মুছে দুর করতে হবে। তাদেরকে পরকালীন সফলতার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তাহলে মানুষ অনেক ধরনের অনিশ্চয়তা, ভোগান্তি এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ থেকে বেঁচে যেতে পারবে।

সূরা আশ শামস

(সূর্য)

এই সুরা শুরুই হয়েছে দৃষ্টি আকর্ষণ মূলক কিছু আয়াত দিয়ে।

> "শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চাঁদের যা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর জাগ্রত হয়।" (সুরা আশ শামস: আয়াত ১-২)

পৃথিবী থেকে সূর্যকে খালি চোখে একটি ছোট্ট গোলাকার থালার মতো মনে হয়। অথচ, মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, যদিও সূর্যের পরিধি পৃথিবীর পরিধি তুলনায় ৩৩০ গুণ বেশি এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৫০ কিলোমিটারের বেশি। সূর্যকে কেন্দ্র করে এখনো পর্যন্ত ১১ টি গ্রহ আবর্তিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে- যার মধ্যে একটি হলো আমাদের পৃথিবী। এই পৃথিবীতে এখন প্রায় ৭০০ কোটি মানুষ বসবাস করছে। আমরা আরো জানতে পেরেছি, মিল্কিওয়ে এর পাশাপাশি এরকম আরো অসংখ্য গ্যালাক্সি আছে। আমরা যে সৌরজগত্ নিয়ে পড়ে আছি বা যতটুকু যা তথ্য নিয়েই অনেক জানার দাবি করছি, তা অসংখ্য গ্যালাক্সি এবং মিল্কিওয়ের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বজগতের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ। এই সুরায় সূর্যের গতিপথ ও বৈশিষ্ট্যের যে বর্ননা দেয়া হয়েছে, তা ১৫শ বছর আগে ওহী হিসেবে নাযিল হলেও বিজ্ঞানীরা এত বছর পর ধীরে ধীরে এই তথ্যগুলো আবিস্কার করতে সক্ষম হচ্ছেন। সুবহানআল্লাহ। যেমন: আল্লাহ তাআলা এই সুরায় বলেছেন,

> "শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর, শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর।" (সুরা আস শামস: আয়াত ৩-৭)

নিঃসন্দেহে এই বিশালতা, ঘুর্ণিয়মান কক্ষপথ, এতো অসংখ্য জানা অজানা সৃষ্টি- এসবই একজন অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

> "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।" (সুরা আল বাকারা: আয়াত ১১৫)

এই ছোট্ট পৃথিবীতে মানুষ এখন বসবাস করছে। মানুষকে যেকোনো কিছু করার এবং যেকোনো বিষয়কে পছন্দ করার স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহতে বিশ্বাস করে আবার কেউ কেউ করে না।

> "অতঃপর তার রব মানুষকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে ব্যক্তি নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" (সুরা আশ শামস: আয়াত ৮-১১)

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে আরো জানাচ্ছে যে, এই মহাবিশ্বকে ঘিরে আছে অসংখ্য ফেরেশতা যারা প্রতিনিয়ত ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করছে।

> "যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (সুরা মুমিন/ঘাফির: আয়াত ৭)

আল্লাহ আরো বলেন,

> "ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।" (সুরা আস শুরা: আয়াত ৫)

এই সূরা ছোট্ট একটি সুরা কিন্তু অনেক গোছানো। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়াবলি, ধারণা এবং নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই সংক্ষিপ্ত সুরাটিতে। মুসলমানরা নামাজে যে কয়েকটি সূরা অনেক বেশি পড়ে তার মধ্যেও এই সুরাটি অন্যতম। সূরা শামস খুবই তথ্যবহুল, উৎসাহব্যঞ্জক এবং অনুপ্রেরণাদানকারী একটি সূরা।

এই সুরায় বলিষ্ঠতার সাথে বলা হয়েছে, কোনো মানুষ তার আত্মাকে কতটা বিশুদ্ধ রাখতে পারে তার ভিত্তিতেই তার সফলতা যাচাই হয়। আরও জানানো হয়েছে যে, মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্নীতি, অবহেলা এবং অজ্ঞতা মানুষকে চরম ব্যর্থতা এবং ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই সূরায় সামুদ জাতির উদাহরণ দেয়া হয়েছে যারা অত্যন্ত এবং জালেম ছিল। তাদের জুলুমের পরিনতিতে সেই সভ্যতাকে আল্লাহ তাআলা শাস্তিস্বরূপ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

> "সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল। অতঃপর আল্লাহর নবি তাদেরকে বলেছিলেনঃ আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ পাঠানো উট ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। অতঃপর ওরা নবির প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উটের পা কেটে ফেলেছিল। সামুদ জাতির পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। আর আল্লাহ তাআলা এই ধ্বংসের কোন ধরনের বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।" (সুরা আশ শামস: আয়াত ১১-১৫)

সুরা আল বালাদ

(পবিত্র শহর)

সুরা আল বালাদের প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, "আমি এই নগরীর নামে শপথ করি।"

এই আয়াতটির মাধ্যমে মক্কা নগরীর কথা বোঝানো হয়েছে- যেখানে নবি মুহাম্মদ (সা.) জন্ম নিয়েছিলেন এবং যেই শহরেই তিনি বসবাস করতেন। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে

> "এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই কেননা আপনি এই শহরেরই নাগরিক।" (সুরা বালাদ: আয়াত ২)

মক্কা সেই সময়ে কট্টরপন্থী মানুষের শহর ছিল। যদিও এই শহরে অনেকেরই আশ্রয় মিলত এবং শহরটি বেশ শৃংখলাবদ্ধও ছিল। তারপরও হযরত মুহাম্মদকে (সা.) এখানে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছিল এবং পরবর্তীতে প্রচন্ড নির্যাতনও মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

এতকিছুর পরও মক্কা শহরটি একটি গৌরবজ্জ্বল নাম, পরিচিতি এবং ইতিহাস ধারণ করেই আছে। কারণ হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং তার সন্তান ইসমাইল (আ.) এই শহরের প্রাণকেন্দ্রে কাবা ঘর নির্মাণ করার পর আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন,

> "হে পরওয়ারদেগার! এই শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন।" (সুরা আল বাকারা: আয়াত ১২৯)

আল্লাহতালা সেই দোয়াটি কবুল করেছিলেন। এই সুরার তৃতীয় আয়াতটি নিম্নরূপ।

> "শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয় (বংশধর)।" (সুরা আল বালাদ: আয়াত ৩)

এখানে জনক বলতে মূলত মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) আর বংশধর শব্দটি দিয়ে হযরত ইসমাইলের (আ.) বংশধর নবি মুহাম্মদের (সা.) কথা বোঝানো হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশেষ নবি এবং তারপরে আর কোনো নবি আসবেন না। আর তিনি রিসালাতের সর্বোচ্চ দায়িত্ব হিসেবে তাওহীদ তথা একত্ববাদ ভিত্তিক জীবন বিধান ইসলামকে পৃথিবীতে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

মানুষকে এ পৃথিবীতে অনেক গুরুদায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আর এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানুষকে প্রতিকুলতাও মোকাবেলা করতে হবে। এই বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন,

> "নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।" (সুরা আল বালাদ: আয়াত ৪)

আল্লাহ তাআলার যে ওহী ও শিক্ষাগুলো আছে তা প্রদান করা হয়েছে মানুষকে শৃংখলাবদ্ধ রাখার জন্য। যাতে মানুষ তার অযাচিত কামনা-বাসনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্যদিকে, যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁর ফায়সালাকে অগ্রাহ্য করে, তাদের ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে,

> "সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না ?" (সুরা আল বালাদ: আয়াত ৫)

একই ধরনের কথা আমরা পবিত্র কুরআনের আরো বেশ কয়েকটি আয়াতেও পাই। যেমন:

> "মানুষ কি মনে করে যে আমি তার শরীরের হাড়গুলো একত্রিত করব না?" (সুরা আল কিয়ামাহ: আয়াত ৩)

মানুষ এই পৃথিবীতে যে সম্পদ ভোগ ও ব্যয় করে তা মূলত আল্লাহর নেয়ামত। যদিও মানুষ নিজেই এর কৃতিত্ব দাবি করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন

> "সে বলেঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি।" (সুরা আল বালাদ: আয়াত ৬)

কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর সাথে দেখা করতে যাবে, তখন যদি তার কাছে ঈমান ও নেক আমলের সংগ্রহই না থাকে তাহলে দুনিয়ার এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ তার কী কাজে লাগবে? আল্লাহ তাই প্রশ্ন করেছেন,

> "সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে না?" (সুরা আল বালাদ: আয়াত ৭)

কে কীভাবে পৃথিবীতে সম্পদ আয় করেছে এবং তা আবার ব্যয় করেছে, আল্লাহ সবাইকেই কিয়ামতের দিন সেই প্রশ্নগুলো করবেন। এর পরের আয়াতে আল্লাহ মানুষকে দেয়া কিছু শারীরিক নেয়ামতের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

> "আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, জিহবা ও ঠোটদুটো? "((সুরা আল বালাদ: আয়াত ৮-৯))

আল্লাহ এই সুরায় মক্কাবাসীদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সময় এসে গেছে। তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস ও চেতনাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসো। তোমরা আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন কর এবং ঈমান ও নেক আমলের পথ অনুসন্ধান কর।

আল্লাহর এই ঘোষণা বাস্তবায়ন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। এগুলো করার জন্য নিজের দিক থেকে যেমন প্রচন্ড ইচ্ছার দরকার হয় ঠিক তেমনি আবার ভীষণ সাহসেরও প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ বলেছেন

> "আপনি জানেন, সে ধর্মের প্রকৃত খুটি (ভিত্তি) ও ঘাটি কী? তা হচ্ছে বন্দী দাসগুলোকে মুক্ত করে দেয়া এবং দুর্ভিক্ষের সময় এতিম, দরিদ্র আত্মীয় এবং ধুলোবালিতে আচ্ছন্ন মিসকীনকে খাবার দেয়া।" (সুরা আল বালাদ: আয়াত ১২-১৬)

পরবর্তী আয়াতগুলোতে আরও বলা হয়

> "অতঃপর আপনি সেই সব সফল বান্দার তালিকায় শামিল হতে পারবেন- যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্য ও রহম করার উপদেশ দেয়। প্রকৃতপক্ষে তারাই সৌভাগ্যবান।" (সুরা আল বালাদ: আয়াত ১৭-১৮)

এগুলো সবই জান্নাতী লোকদের বৈশিষ্ট্য। তারা সবসময় নিখুঁতভাবেই ভালো কাজগুলো করার চেষ্টা করেছে। যারা ঈমানদার তারা সবসময় সতর্ক ও সক্রিয় থাকে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে ভালো ভালো কাজ করতে চায়। কারণ তারা জানে এই সব নেক আমলের বিনিময়েই পরকালীন জীবনে তাদের জান্নাত দেয়া হবে।

আর বিপরীতে, যারা খারাপ ও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হয়ে আছে তাদের পরিণতি হবে ভিন্নরকম। এই সূরায় তাও নিশ্চিত করা হয়েছে

> "আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।" (সুরা আল বালাদ: আয়াত ১৯-২০)

এই সুরার মাধ্যমে এই বিষয়টিও বোঝানো হয়েছে যে, ইতোপূর্বে যে নবি রাসূলদের প্রেরণ করা হয়েছিল তারা আরব অঞ্চলের সকল মানুষকে আল্লাহর বাণী ও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসতে সফল হননি। তাদেরকে সেই দায়িত্বও দেয়া হয়নি। কিন্তু শেষ নবি হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে জন্ম নিয়ে এমন একটি সম্প্রদায় তৈরি করতে পেরেছেন যারা ঈমানের মশালকে শুধু আরবে নয় বরং বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

সূরা আল ফজর

(ভোর)

শপথ ফজরের।

এই সূরা শুরু হয়েছে ভোর বেলার কথা উল্লেখ করে। ভোর হচ্ছে এমন একটি সময় যখন রাত শেষ হয় আর নতুন একটি দিনের সূচনা হয়।

এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে ১০ রাতের কথা বলা হয়েছে।

> "শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার" (সুরা আল ফজর: আয়াত ২)

অধিকাংশ মুফাসসির মনে করেন এই দশটি রাত দিয়ে ইসলামী ক্যালেন্ডার এর ১২তম মাস অর্থাৎ যিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ রাতের কথা বলা হয়েছে। এই মাসের নবম দিনটি আরাফাতের দিন আর ১০ম দিনটি কুরবানির দিন হিসেবে পালিত হয়। প্রতিবছর এই দিনগুলোতে সারাবিশ্ব থেকে মুসলমানরা হজ্ব আদায় করার জন্য পবিত্র নগরী মক্কার সমবেত হয়। এ সময় তারা আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করে এবং হজ্বের অন্যন্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।

> "এরপরের আয়াতে আল্লাহ জোড় ও বিজোড় সব সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন। এরপর তিনি আবারও বলেছেন, এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে।" (সুরা আল ফজর: আয়াত ৪)।

এখানে সময়ের মতিভ্রমকে বোঝানো হয়েছে। সৃষ্টির অন্যতম একটি রহস্যময় এবং জটিল বিষয় হল সময়। সময়ের প্রকৃত সংজ্ঞা কেবলমাত্র সময়ের সম্ভাব্য প্রভাব বা পরিণতির ভেতর দিয়েই অনুধাবন করা যায়।

এই সূরায় নবি মোহাম্মদকে (সা.) আরেকদফা নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ সবসময় তাকে সাহায্য করবেন এবং ইসলামকেও সমুন্নত রাখবেন। যারা ইসলামের শত্রু, যারা ইসলামকে দুর্বল করতে চায় আল্লাহ বরং তাদেরকেই দুর্বল করে দেবেন। তারা যতই শক্তিশালী ও বর্বর হোক না কেন আল্লাহ তাআলা তাদের সকল অপচেষ্টাকেই নস্যাৎ করে দিবেন। এই সূরায় নবি মুহাম্মদকে (সা.) পুরনো ইতিহাসগুলো আবারো স্মরণ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলছেন,

> "আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন? যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল। গোটা বিশ্বের কোথাও তাদের মতো শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান মানুষ ছিল না। আল্লাহ সামুদ গোত্রের কী পরিনতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাও কী আপনি দেখেননি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। সেই সাথে মহাশক্তির দাবিদার ফেরাউনের করুন পরিনতির কথাও আপনি স্মরণ করুন।" (সুরা আল ফজর: আয়াত ৬-১০)

প্রাচীনকালের মানব সম্প্রদায়গুলো অনেক ভূখন্ড জয় করতে পারেনি অথবা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও খুব বেশি সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তবে তাদের যতটুকু ধ্বংসাবশেষ বা নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে, তারা খুব

দক্ষ হস্তশিল্পী ছিলেন। স্থাপত্যবিদ্যায়ও তাদের ব্যাপক দক্ষতা ছিল। নবি মুহাম্মদকে (সা.) যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

> "তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর দেখে না যে; তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা জমিন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।" (সুরা আর রুম: আয়াত ৯)

ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণেই তাদের ক্ষমতা বাহাদুরি তাদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ বলেন,

> "অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। নিশ্চয় আপনার পালকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।" (সুরা আল ফজর: আয়াত ১৩-১৪)

এই সুরার পরের আয়াতে আল্লাহ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তিকে তুলে এনেছেন। মানুষ সবসময় বর্তমানকে ঘিরে বাঁচতে চায় এবং ভবিষ্যতের জবাবদিহিতার বিষয়টিকে মানুষ খুব একটা পাত্তাও দিতে চায় না।

> "মানুষ এমন যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না।" (সুরা আল ফজর: আয়াত ১৫-১৭)

মূলত, আল্লাহ তাআলা তার নিজস্ব নিয়ম, প্রজ্ঞা ও বিবেচনার আলোকে প্রতিটি মানুষের জীবিকা ও ভাগ্য নির্ধারণ করেন। আল্লাহ কখনো কখনো মানুষকে প্রাচুর্যতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার কখনো বা দারিদ্রতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। কখনো জয় দিয়ে আবার কখনো পরাজয় দেয়ার মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলেন। তাই সুখকর কিছু হলেই আল্লাহ আমার প্রতি খুব উদার হয়ে আছেন আর নেতিবাচক কিছু হলেই তা'আলার অসন্তোষের কারণে হচ্ছে এরকম বিবেচনা করার সুযোগ নেই। আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে নানাভাবে, নানা পন্থায় পরীক্ষা করেন। আল্লাহ এমনটা করেন পরকালীন জীবনে মানুষের গন্তব্যকে নির্ধারণ করার জন্য।

আল্লাহ যখন কাউকে সম্পদ দেন তার মানে এই নয় যে তিনি সে ব্যক্তিকে আনুকূল্য করছেন। এমনও উদ্দেশ্যে নয় যে, সে অপরের কাছে বলে বেড়াবে,

> "আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।" (সুরা আল কাহফ: আয়াত ৩৪)

মানুষের মাঝে সম্পদের মালিকানা ভোগ বা প্রাচুর্যতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সবসময়ই পার্থক্য ছিল। দুনিয়াতে যারা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত এবং অনুগ্রহ পায় তাদের উচিত তাদের সম্পদগুলোকে অন্য সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়া। সেইসাথে, দরিদ্র পীড়িত মানুষগুলোকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্রতা নিরসনের উদ্যোগ নেয়া। আল্লাহ কাউকে সম্পদ দিলে সে সম্পত্তি কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়। একজন সামর্থবান ব্যক্তির উচিত নয় অন্যদেরকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া অথবা অন্যদের মনে হিংসা বা প্রতিহিংসার জন্ম দেওয়া। বরং তার দায়িত্ব হলো, মানুষের সক্ষমতা বাড়ানো যাতে তারা সব ধরনের অযাচিত লোভ লালসা ও টাকার মোহ থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এই সুরায় আল্লাহ তাই বলেছেন,

> "তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাসো।" (সুরা আল ফজর: আয়াত ১৭-২০)

প্রতিটি প্রজন্মের মাঝেই রিযিক নিয়ে এক ধরনের লড়াই বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ সময়ই, মানুষ অন্যের উপকার করার ইচ্ছার তুলনায় বরং লোভ এবং লালসা দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। পরের স্বার্থ দেখার তুলনায় বরং কিপটেমির চর্চা বেশি করেছে। এটা খুবই মর্মান্তিক যেম প্রতিটি যুগেই ধর্মীয় শিক্ষাগুলোকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে আর ভোগবাদিতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। আধুনিক সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে, কম্যুনিস্টরা খোদাকে স্বৈরাচার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে কেননা তাদের অভিযোগ হলো সৃষ্টিকর্তা সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য করেছেন। এই তথাকথিত বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে তারা সম্পদ বন্টনের দায়িত্বকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সমাজে আরো ব্যাপকভাবে স্বৈরাচারীতা, অন্যায্যতা এবং ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক পৃথিবীতে ও সভ্যতার অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদান কী বা কতটুকু? অনেকেই হয়তো উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো অবদানই খুঁজে পাবেন না। মুসলমানরা নিজেদের জীবন যাপন এবং আচার-আচরণে নৈতিকতার চর্চা না করায় এবং ঈমানী চেতনাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার কারণে ইসলাম সম্বন্ধে অনেক জায়গাতেই একটি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলমানরা নিজেদের ভূখন্ডে ন্যায়বিচার, আত্মমর্যাদা এবং সম্মান আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভিনদেশে গিয়ে সেগুলো পাওয়ার চেষ্টা করছে। এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতির আরো খারাপ হচ্ছে। কিন্তু আসলে আমাদের উচিত ছিল, দুনিয়ায় আরাম আয়েশ ও সম্মানের পেছনে না ঘুরে বরং পরকালে ন্যায় বিচার, সম্মান ও শান্তি পাওয়ার পথকে সুগম করা। এবং সেই লক্ষ্যে দুনিয়ার এই ক্ষনস্থায়ী জীবনে নিয়মিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ বলেন,

> "এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চুর্ণ-বিচুর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু আগেই প্রেরণ করতাম!" (সুরা আল ফজর: আয়াত ২১-২৪)

যারা খারাপ কাজ করছে তারা পরকালে শুধু আফসোসই করবে আর অনুশোচনায় লিপ্ত হবে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আর যারা ঈমানদার তাদের জন্যে পরকাল হবে আনন্দের আর প্রশান্তির। এই সুরার শেষ আয়াতগুলোতে তাই বলা হয়েছে যে,

> "হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সুরা আল ফজর: আয়াত ২৭-৩০)

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একবার একজন ব্যক্তি নবি মুহাম্মদের (সা.) উপস্থিতিতে সুরা আল ফজরের শেষ আয়াতগুলো পাঠ করছিলেন। হযরত আবুবকর (রা.) তখন এই আয়াতগুলোর খুবই প্রশংসা করলেন। নবিজি (সা.) বললেন, আজকে তুমি যেই শব্দগুলো দিয়ে এই সুরার প্রশংসা করলে তোমার মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা ঠিক একইভাবে তোমার প্রশংসা করবে।

রাসুলের (সা.) এই বার্তাটি হযরত আবুবকরের (রা.) জন্য ছিল বিশেষ ধরনের প্রাপ্তি। নবিজির (সা.) ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত সঙ্গী হওয়ায় তিনি এই বিরাট সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ পেয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিতে পারবে এবং যারা মার্জিত ভাবে জীবন যাপন করবে ও সৎকাজ করবে আল্লাহ তাদেরকে সম্মান ও সম্পদকে আরো বাড়িয়ে দিবেন, তাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন।

সূরা আল গাশিয়াহ

(হতবিহ্বলকারী সেই দিন)

এই সূরাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে।

> "আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী এবং হতবিহ্বলকারী কেয়ামতের খবর পৌঁছেছে কি?" (সুরা আল গাশিয়াহ: আয়াত ১)

এই সূরার নামকরণ আল গাশিয়াহ- যা দিয়ে পুনরুত্থান দিবসকে বোঝানো হয়েছে। কেননা এই দিনটিই হলো এমন একটি দিন যখন মানুষের মন চারপাশের দৃশ্যবলী দেখে বিস্ময়ে, ভয়ে, আতঙ্কে রীতিমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে। এই সূরা নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি এবং আশংকার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে ভয় এবং আশা জাগিয়ে তোলে। পাশাপাশি, এই সুরাতে আরবের নাগরিকদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে, যাতে তারা চারিপাশের প্রকৃতির দিকে গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করে। কীভাবে উটের মত একটি প্রাণী চলাচল করছে এবং আরবঞ্চলের চারিপাশে উচু পাহাড় পর্বত দিয়ে কীভাবে দিগন্তকে বিস্তৃত এলাকাকে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে- এগুলো যথেষ্ট চিন্তা ও বিবেচনার দাবি রাখে। প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের প্রতি আরবদেরকে মনোযোগী হতে বলা হয়েছে এই সত্যটি বোঝানোর জন্য যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হলেন যথার্থ প্রতিপালক। এবং একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তাই আরবেরা উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব দেব-দেবীর এবং মূর্তির পূজা করে আসছে, সেগুলো পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

এই সুরায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মূল দায়িত্বকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মুল কাজ হলো অপরকে আলোকিত করা এবং সত্যিকারের বাস্তবতাগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ এই পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে বেমালুম ভুলে গেছে, তাই মুসলমানদের উচিত হলো খোদাদ্রোহী এবং নাফরমান ও অনিষ্টকারী শক্তিগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। মুসলমানদের শক্তির মূল উৎস হল পবিত্র আল-কুরআন। আল কুরআনের কারণেই মুসলমানরা সম্মানিত হয়েছে। আল কুরআনই মুসলমানদেরকে মর্যাদার অধিকারী করেছে অথচ এখন আমরা সেই কুরআনকেই অবহেলা করতে শুরু করেছি।

এই সূরা হুমকি দেয়া হয়েছে যে, যারা এই পৃথিবীতে খারাপ কাজ করছে তাদের জন্য মহা বিপর্যয় ও দুর্দশা অপেক্ষা করছে। বলা হয়েছে

> "অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। "(সুরা আল গাশিয়াহ: আয়াত ২-৩)

আরো বলা হয়েছে, তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে এবং এমন খাবার দেয়া হবে যা তাদের কল্যাণে আসবে না' ।

> "তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। কাঁটাযুক্ত ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।" (সুরা আল গাশিয়াহ: আয়াত ৪-৭)

অপরপক্ষে দুনিয়াতে যারা ঈমানদার হিসেবে জীবনযাপন করবে, পরকালীন জগতে তারা ভিন্ন স্বাদের জীবন উপভোগ করবে।

> "অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব, তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে, সুউচ্চ জান্নাতে। সেখানে তারা কোনো অসাড় কথাবার্তা শুনবে না। সেখানে আরো থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। উন্নত সুসজ্জিত আসন। এবং সংরক্ষিত পানপাত্র এবং সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।" (সুরা আল গাশিয়াহ: আয়াত ৮-১৬)

এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, জান্নাত হলো সেই স্থান যেখানে আজেবাজে কথা হয়না। অসংলগ্ন কোনো কাজও করা হয় না। কেননা যারা সত্যিকারের জ্ঞানী ও ধার্মিক, তারা এ ধরনের কাজ করতে পারে না। চিন্তাশীল মানুষের উচিত পৃথিবীকে সঠিকভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করার জন্য নিজেদের মনকে তৈরি করা। পৃথিবীর অনেক কিছুই আছে যা মানুষের শারীরিক অস্তিত্ব এবং স্বাভাবিক জ্ঞান দিয়ে মূল্যায়ন করা যাবে না।

> "তারা কী উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না, তা কীভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কীভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?" (সুরা আল গাশিয়াহ: আয়াত ১৭-২০)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষকে উন্মুক্ত ভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে তারা বিশ্বজগতের সকল নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলো এবং পার্থিব সকল সৃষ্টিকে বুদ্ধিমত্তার সাথে পর্যবেক্ষণ করে। তবে প্রাথমিক যুগের স্কলারদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি খুব বেশি পাওয়া যায় তাহলো তারা অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। এতে অবশ্য খুব বেশি দোষেরও কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, তারা আল কুরআনের দর্শন বোঝার তুলনায় গ্রীক দর্শন সাধনা নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এই সুরার ২১-২৩ নং আয়াতে এমন একটি অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে ইসলামের মূল মিশন তথা দাওয়াতি কাজের সারাংশ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ বলেন

> "অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন।" (সুরা আল গাশিয়াহ: আয়াত ২১-২২)

এখানে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে এমন কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি যাতে তারা পার্থিব কোনো লোভে পড়ে একটি স্বৈরাচারী, ঔপনিবেশিক এবং আধিপত্যবাদী সম্প্রাদায়ে পরিণত হয়। বরং তাদের এমন একটি সম্প্রাদায় হয়ে ওঠার চেষ্টা করা উচিত যারা মানুষের মনকে মুক্ত করবে এবং নিখুঁতভাবে সৎ কাজ করার ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করবে। মুসলিম দেশ কখনোই কোনো একটি গোত্র বা জাতিগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করবে না। বরং একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সব ধরনের প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্যই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

বর্তমান সময়ে এসে, মানবিক গুণাবলীকে আমরা নেতিবাচক হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেছি। অন্যদিকে যারা খারাপ কাজ করছে, অনাচার করছে, পাপে ডুবে থাকছে তারাই সমাজে বেশি নিরাপত্তা ও সম্মান পাচ্ছে। সততা, ন্যায় বিচার এবং ঈমান রক্ষা করার জন্য এখন তাই অত্যাবশ্যক হিসেবে একটি দায়িত্বশীল ঈমানদার সম্প্রাদায়ের

উত্থানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে, চেষ্টার পরিণতে যাই হোক না কেন আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

> "নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট,অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।" (সুরা আল গাশিয়াহ: আয়াত ২৫-২৬)

সূরা আল আলা

সবচেয়ে উঁচু

> "আপনি আপনার মহান পালনকর্তা, সর্বোচ্চে সমাসীন আপনার রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন। যিনি সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং যিনি সকল সৃষ্টির পরিনতি ও গন্তব্য নির্ধারণ করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন।" (সুরা আল আলা: আয়াত ১-৩)

এই আয়াতে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশালতা ব্যাপকতা এবং তাঁর সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কোন ভৌগলিক বা শারীরিক উচ্চতার কথা বোঝানো হয়নি যেমনটা ফেরাউন তার বোকামির জন্য বুঝে ছিল। তাকে যখন সুউচ্চে আল্লাহ তাআলার সমাসীন থাকার বিষয়টি বলা হয় তখন সে উত্তর দিয়েছিল যে,

> "হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার রবকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী।" (সুরা আল কাসাস: আয়াত ৩৮)

অথবা সাম্প্রতিক অতীতে আমরা একজন রাশিয়ান নভোচারীর কথা জানি, যিনি মহাকাশে অভিযানে গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে সবাইকে দম্ভভরে বলেছিল আমিতো গোটা মহাকাশ ঘুরে আসলাম। কোথাও তো তোমাদের খোদাকে খুঁজে পেলাম না।

মুসলমানেরা প্রতিদিন বেশ কয়েকবার আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে ইবাদত করে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপরে বসে আছেন। আর আল্লাহর আরশ গোটা মহাবিশ্বকে ঘেরাও করে আছে। মহাবিশ্বের যেখানে সেখানে যা কিছু হচ্ছে তা আমাদের বাস্তব চোখে দেখা জ্ঞান এবং স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতার বাইরে। মানুষের মানবিক সক্ষমতা দিয়ে সামান্য একটা অনু-পরমানুর অন্তর্নিহিত রহস্যও অনুধাবন করা যায় না। এই সীমিত সাধ্যের মানুষ তাহলে কীভাবে আল্লাহ তাআলার মহিমা এবং বিশালতাকে ধারণ করবে?

আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছুকে শূন্য থেকে অত্যন্ত পরিশীলিত এবং সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রতিটি বিষয় এবং বস্তুর একটিকে অপরটির পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যাতে সবগুলো উপকরণ মিলে সামঞ্জস্য করে চলতে পারে। বিজ্ঞান আমাদেরকে বর্তমান সময়ে এসে জানাচ্ছে যে, নানা আকৃতি ধারণ করে হলেও পৃথিবীতে পানির অনুপাতটি মোটামুটি একই রকমভাবেই বজায় থাকে। মানুষ, প্রাণী, গাছপালা এবং অন্য জীবজন্তু বিভিন্নভাবে পানি পান করে বা নিজের ভিতরে গ্রহণ করছে। এরপরও প্রতিমুহূর্তে বিপুল পরিমান বাষ্পীকরণ, বা বরফ হয়ে কিংবা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে পানির এই অনুপাতটি একই থেকে যায়। এই সুরায় বলা হয়েছে,

> "এবং যিনি সবুজ গাছপালা উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর তাকে আবার শুষ্ক ঘাসে পরিনত করে দিয়েছেন।" (সুরা আল আলা: আয়াত ৪-৫)

প্রকৃতপক্ষে, এগুলো সবই মানুষের উপকারে আসে। মানুষের বেঁচে থাকা, শাকসবজি উৎপাদন এবং পরিবেশের জন্য সবুজ গাছের এবং শুষ্ক ঘাস- দুটোরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আল্লাহ আরো বলেন,

> "আমি আপনাকে কুরআন পাঠ করাতেই থাকব, তাই আপনি বিস্মৃত হবেন না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়।" (সুরা আল আলা: আয়াত ৬-৭)

এই আয়াতের মাধ্যমে নবি মুহাম্মদকে (সা.) আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সবসময় নবিকে (সা.) সাহায্য-সহযোগিতা করে যাবেন যাতে যাতে তিনি ইসলামের সুমহান বার্তাকে মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারেন। আল্লাহ তাআলা রিসালাতের দায়িত্বকে নবিজির (সা.) জন্য সহজ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহ তাআলার ঘোষণা আর ইসলামের সুমহান বার্তা স্থান, কাল, পাত্রের যাবতীয় গন্ডির উর্ধ্বে। তাছাড়া ইসলাম বরাবরই আমাদের সকলের জন্যই সহায়ক এবং সহনশীল একটি জীবন দর্শন।

আল্লাহ আরো বলেন,

> "আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন।" (সুরা আল আলা: আয়াত ৮-৯)

নবি মুহাম্মদের (সা.) দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া। তাদেরকে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। যারা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান তারা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। আর যারা বোকা তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

> "যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, আর যে, হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে।" (সুরা আল আলা: আয়াত ১০-১২)

মানুষের যেমন চরম উৎকর্ষতা সাধনের সুযোগ রয়েছে তেমনি মানুষ খুব সহজেই পতনের দ্বারপ্রান্তেও পৌঁছে যেতে পারে। মানুষ যত সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জন করুক না কেন, তা তাকে এই পতন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ যদি পৃথিবীর সব সম্পদের মালিকও হয় কিন্তু তার পাশাপাশি আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে তার কোন কল্যাণ হলো না। বরং তার মতো হতভাগা আসলে আর কেউ রইলো না। অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর বিপরীতে পরকালীন জীবনের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে। নবিজির (সা.) নাতি ইমাম হাসান (রা.) বলেন, মৃত্যুর মত একটি জলজ্যান্ত সত্যকে যেভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয় আর কোনো সত্যের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। অথচ প্রতিটা দরজায় মৃত্যু কড়া নাড়ে। যুবক, শিশু কিংবা বৃদ্ধ- যে কাউকেই মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

> "নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করবে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (সুরা আল আলা: আয়াত ১৪-১৭)

সূরা আত তারিক

রাতের পরিভ্রমণকারী/রাতের আগন্তক

> "শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। আপনি জানেন, যে রাত্রিতে আসে সেটা কি? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।" (সুরা আত তারিক: আয়াত ১-৩)

এই মহাবিশ্বে অসংখ্য অন্ধকার গ্রহ আছে। পৃথিবী তার মধ্যে একটি- যার নিজস্ব কোনো আলো নেই। আবার সূর্যের মতো এমনও অসংখ্য তারাও আছে যেগুলো নিজে জ্বলতে পারে এবং আলো বিতরণ করতে পারে। এই সুরায় রাতে ভ্রমণকারী বলতে এমন একটি তারাকে বোঝানো হয়েছে যাকে আরবেরা আল শাহিদ বা সাক্ষী বা প্রমাণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করত। সাধারণত, সূর্যাস্তের সময় এই তারাটি দৃশ্যমান হতো। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল শহীদ বলতে একসাথে বেশ কয়েকটি তারাকেও বোঝানো হতো।

> "প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।" (সুরা আত তারিক: আয়াত ৪)

তার মানে হলো, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি মানুষের উপর নজর রেখেছেন। প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকান্ডগুলোকেও সেভাবেই সংরক্ষন করা হচ্ছে।

পরের দুটি আয়াতে বলা হচ্ছে যে,

> "অতএব, মানুষের দেখা উচিত কী বস্তু থেকে তার জন্ম হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সবেগে ধাবমান স্খলিত পানি থেকে যা মেরুদন্ড আর বুকের পাজরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। (সুরা আত তারিক: আয়াত ৫-৭)

পবিত্র কুরআন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ে এতটাই দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠতার সাথে মন্তব্য করেছে যে অনেক সময় আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে ভূনবিজ্ঞানীরা কুরআনে প্রদত্ত তথ্যগুলো আবিষ্কার করতে পেরে বিস্মিত হয়ে পড়েন। মানুষের শরীরের গঠনের বিষয়গুলো যেভাবে কুরআন বর্ণনা করেছে তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য, অলৌকিক এবং এটাই কুরআনের বিশেষত্ব।

এটা সবাই জানে যে, পুরুষের থেকে যে শুক্রাণু বের হয় সেখান থেকেই মানুষের গাঠনিক কাঠামোর প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন থলি বা গ্ল্যান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এই সবকিছুই মস্তিষ্কের নার্ভ সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত থাকে। পাশাপাশি, আমরা যে পরিবেশের মধ্যে বসবাস করি সেখান থেকেও আমরা বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে থাকি। এগুলো সবই আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক। আমরা পরিবেশ থেকে পানি, সূর্যের আলো, জ্বালানি শক্তি এবং মাটিকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করি। এরপরও কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সৃষ্টির এই অলৌকিকতা অনুধাবন করতে পারে না বরং অস্বীকার করে। তারা ভুলে যায় যে, এই অস্বীকৃতি এবং অগ্রাহ্যের কারণে একদিন তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

> “যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।” (সুরা আত তারিক: আয়াত ৯-১০)

এই সুরার পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির আরো বেশ কিছু নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে কৃষক জমিতে বীজ বপন করে, মাটি চাষাবাদ করে। আকাশ ভেঙ্গে সেখানে বৃষ্টি পড়ে। সব কিছু মিলেই সেই ছোট্ট বীজ থেকে নতুন নতুন গাছ হয় যা দিয়ে মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হয়।

ছোট্ট যে অসহায় শিশু থাকে তার খাবারও এই পৃথিবী থেকে এভাবেই জোগাড় হয় এবং ক্রমান্বয়ে সে আবার শক্তিশালী ও পরিনত মানুষ হয়ে ওঠে। সেইসব পরিণত মানুষ থেকে আবার নতুন নতুন বাচ্চার জন্ম হয়। এ যেন চমৎকার একটি চক্র। আল্লাহ ছাড়া আর কার ক্ষমতা আছে যে, এই বিশাল সৃষ্টিজগতকে এত সুন্দরভাবে পরিচালিত করবে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম সৃষ্টি করে যাবে? আল কুরআনের এই সূরাটি যেন সেই বার্তাটি প্রদান করেছে।

> “নিশ্চয়ই কুরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা। এবং এটা উপহাস নয়। তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, আর আমিও কৌশল করি। অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে।” (সুরা আত তারিক: আয়াত ১৩-১৭)

সূরা আল বুরুজ

নক্ষত্রমন্ডলী

একটি প্রকাশ্য ঘোষণার মধ্যে দিয়ে এই সুরাটি শুরু হয়েছে।

> "শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,এবং শপথ সেই সাক্ষীর এবং যা সে সাক্ষ্য দেয়। অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত নিক্ষেপনকারীরা অর্থাৎ,অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা;" (সুরা আল বুরুজ: আয়াত ১-৫)

এইখানে মূলত মাটিতে তৈরি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডগুলোর কথা বলা হয়েছে যেখানে অনেক সময় ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে শুধুমাত্র ঈমান ধারণ করার জন্য নিক্ষেপ করা হয়েছে। মানব ইতিহাসে এরকম অসংখ্য ঘটনার নজির পাওয়া যায় যেখানে জালিম শাসকদের হাতে বিশ্বাসীদেরকে এভাবে আগুনে পুড়ে শহীদ হতে হয়েছে। এইসব জালিম শাসকদের বর্বরতার কোন সীমা ছিল না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু শহীদকে জানার সুযোগ পেয়েছি। আমার মনে হয়েছে যে, এই মানুষগুলো শুধুমাত্র শাহাদাতের কাঙ্ক্ষিত পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জালিমদের জন্য তাদের মধ্যে কোনো ভয় ছিল না। বরং জালিমদের জন্য তাদের হৃদয়ে ছিল একরাশ আফসোস আর হতাশা। কেননা জালিমরা মিথ্যা অপপ্রচারের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে থাকে। এমন শহীদদের সান্নিধ্যও আমি পেয়েছি যারা শাহাদাত কবুল হওয়ার জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠিত বোধ করতেন না। কারণ তারা জানতেন তারা সত্যপথের উপর অটল আছেন।

আমি এমন একজন শহীদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম যিনি শাহাদাতের কয়েক মুহূর্ত আগে আমাকে বলেছিলেন, 'সত্যের পথে জীবন দেওয়া মানে হল নতুন করে আবার জীবনের সন্ধান পাওয়া।' আজ থেকে ৫০ বছর আগে আমার কাছে একদল যুবক বিদায় নিতে এসেছিল। তারা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহন করতে যাবে। ঐ যে বিদায় নিয়ে গেলো, এই যুবকদের কাউকেই আমি আমার জীবনে আর কখনো দেখতে পাইনি। সবাই ফিলিস্তিনে যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহসিকতায় আর বিরোচিত কর্মকান্ড প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে আলোচিত হচ্ছে।

সুরা আল বুরুজে মূলত একজন নারীর কথা বলা হয়েছে যাকে শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য সন্তানসহ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রথম অবস্থায় মহিলাটি কিছুটা ইতস্তত বোধ করছিলেন; তবে সেটা নিজের জন্য নয় বরং তার সন্তানের মায়ায়। একটু পর যখন সেই সন্তানই তাকে বলল যে, "মা তুমি ভয় পেয়ো না কারণ আমরা সত্যকে ধারণ করার জন্যই শাহাদাত বরণ করতে যাচ্ছি তখন মা যেন দ্বিগুন উৎসাহিত হলেন এবং অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

“তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল,যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।” (সুরা আল বুরুজ: আয়াত ১০-১২)

সূরা আল ইনশিকাক

আমাদের কাছে মাথার উপরের আকাশটাকে অনেক সময় শুধুমাত্র বিস্তৃত নীল গম্বুজ বলেই মনে হয়। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, আকাশের গাঠনিক কাঠামোর খুব অল্পটুকুই আমরা জানতে পেরেছি। আকাশে বসবাসরত প্রানীকূল সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা খুবই সীমিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সুরার মাধ্যমে জানাচ্ছেন যে, যখন কিয়ামতের সেই মুহূর্ত আসবে তখন বিস্তৃত আকাশটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ভেঙে পড়বে। বলা হয়েছে:

> "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত।" (সুরা আল ইনশিকাক: আয়াত ১-২)

আমাদেরকে আরও জানানো হয়েছে, পৃথিবী সেদিন চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। শেষ দিন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যা দাফন ও বোপন করা হয়েছে, কিয়ামতের মুহুর্তে পৃথিবী সেই সব কিছুকেই উগরে বের করে দিবে।

পবিত্র কুরআনের অন্য এক সুরার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, সৃষ্টির আগে আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

> "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।" (সুরা হামীম সেজদাহ: আয়াত ১১)

কিন্তু যখন পৃথিবীর শেষ সময় তো চলে আসবে তখন আকাশ কিংবা মাটির আর তাদের ইচ্ছার বশবর্তী হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। বরং তারা আল্লাহর আদেশ মানতে বাধ্য হবে। আর এরপরেই আসবে সেই মুহূর্ত, অন্তিম ক্ষণ- যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে। এই সুরায় আল্লাহ সেই তথ্যগুলোই জানিয়ে দিয়েছেন। মূলত আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটা হলো কঠোর পরিশ্রম, দায়িত্ব আর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার একটি স্থান। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

> "হে মানুষ, তোমাকে তোমরা পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। (সুরা আল ইনশিকাক: আয়াত ৬)।

তবে এখানে মানুষকে চিন্তা করবার বা কোন একটি বিষয়কে পছন্দ করবার স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে।

> "শেষ বিচারের দিন, যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছন দিক থেকে দেয়া, হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে, এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সুরা আল ইনশিকাক: আয়াত ৭-১২)

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যারা পৃথিবীতে খারাপ কাজ করবে তাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দিয়ে দেওয়া হবে। সেই আমলনামা বাম হাতে গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সেদিন আর কোনো উপায় থাকবে না। সেদিন বাম হাতে আমলনামা দেওয়ার বিষয়টি অপমান ও উপহাসের বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। শেষ

বিচারের দিন এই কপালপোড়া মানুষগুলোর থেকে আল্লাহ তাআলা মুখ ফিরিয়ে নেবেন ঠিক যেমনিভাবে এ পৃথিবীতে থাকাকালীন অবস্থায় তারা আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল এবং আল্লাহর পাঠানো বার্তাকে অগ্রাহ্য করেছিল।

> "সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন।" (সুরা আল ইনশিকাক: আয়াত ১৪-১৫)

অর্থাৎ, পার্থিব জীবনে স্বাধীনতা পেয়ে এই মানুষগুলো যেমন আল্লাহর গোমরাহিতে লিপ্ত হয়েছিল। ঠিক তেমনি, আল্লাহও তাদেরকে তখন অবকাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা সবসময়ই তাদের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত ছিলেন।

এই সুরার পরের অংশে কুরআনের অনবদ্য রচনাশৈলী প্রয়োগ করে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় বলা হয়:

> "আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে এবং চাঁদের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে,নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে।" (সুরা আল ইনশিকাক: আয়াত ১৬-১৯)

এই আয়াতগুলোর প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা হল এই আল্লাহ এখানে মুসলমানদের পার্থিব জীবনের পরীক্ষা, সংকট, সফলতা এবং ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই আয়াতগুলোর বিষয় নিয়ে চিন্তা করা অবস্থায় আমি একদিন তিরমিজি শরীফের একটি হাদিস পড়েছিলাম। সেই হাদীসটিকে আমার এই আয়াতগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাইদ আল খুদরি (রা.)। তিনি বলেন, একদিন আসরের নামাজের পর রাসুল (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং সমবেত জনতার সামনে কিয়ামত সম্পর্কে বেশ লম্বা সময় জুড়ে আলোচনা করলেন। একটা পর্যায়ে তিনি বললেন, পৃথিবীর জীবনটা হলো সবুজ, সজীব এবং মিষ্টি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই জীবনের দায়িত্ব দিয়ে স্বাধীন করে পাঠিয়েছেন এটা দেখার জন্য যে, আমরা তাঁর প্রতি কতটুকু অনুগত ও স্বচ্ছ থাকতে পারি।

এটা বাস্তব যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে প্রকৃত সত্যটি জেনে যাওয়ার পর কোন মানুষেরই আর অন্য কোন মানুষের জাগতিক ক্ষমতাকে ভয় পাওয়ার সুযোগ নেই। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এই হাদীসটি শেষ করতে গিয়ে বলেন, "রাসুল (সা.) এই আলোচনাটি করছিলেন তখন সামনে উপস্থিত জনগণের অনেকেই বারবার সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর বোঝার চেষ্টা করছিলেন যে, সূর্য কখন অস্ত যাবে, দিনের আলো কখন শেষ হবে। বেলা শেষ হয়ে গেলে হয়তো তারা আর এই আলোচনাটি আর শোনার সুযোগ পাবে না। সেই দৃশ্য দেখে রাসুল (সা.) বলেন অস্তগামী সূর্য ডুবতে ঠিক যতটুকু সময় আছে এই পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হতেও ঠিক ততটুকু সময়ই বাকি আছে।"

কিয়ামতের সেই ক্ষণের যতটুকু সময় বাকি থাকুক না কেন এই পর্যন্ত পৃথিবীর যে ইতিহাস তা মূলত মুসলিম জাতির ইতিহাস- যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই বাস্তবতায় এখন যে প্রশ্নগুলো আমাদের সামনে আসে,

তা হলো: বিশ্ব মানবতার জন্য মুসলমানদের যে দায়িত্ব ছিল মুসলমানরা কী তা করতে পেরেছে? মুসলমানরা কী পার্থিব জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনতে পেরেছে? মুসলমানরা কী ইতিহাস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা নিয়েছে?

শেষ বিচারের দিন মুসলমানদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, তারা কুরআনের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত ছিল? কুরআনের নীতিমালা বিশ্ববাসীর সামনে তারা কতটুকু উপস্থাপন করতে পেরেছে? এরকম আরো কিছু প্রশ্নও এই সুরার শেষাংশেও তোলা হয়েছে। যেমন:

> "অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না।" (সুরা আল ইনশিকাক: আয়াত ২০-২১)

সূরা আল মুতাফফিফীন

এই সূরাটিও যেন এর পরবর্তী সূরার বর্ণনার ধারাবাহিকতাই বলে যাচ্ছে। এখানে আমল এবং তার প্রতিদানের সম্পর্কটি তুলে ধরা হয়েছে। আমল ও সওয়াবের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে বেশ ভুল বোঝাবুঝি আছে। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও নানা ধরনের বিকৃত ধারণার অস্তিত্ব দেখা যায়।

সব সময় কিছু স্বার্থপর মানুষ পাওয়া যাচ্ছে যারা কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজন ও নিজেদের স্বার্থকে নিয়ে ভাবছে। এমনকি সেই চাহিদা বা প্রয়োজনগুলো অন্যায্য হলেও তারা তা পূরণে দ্বিধা করছে না। তারা অন্যের চাহিদা বা প্রয়োজন নিয়েও কোনো মাথা ঘামাচ্ছে না। এমনকি অন্যের চাহিদা বা অবস্থানটি ন্যায্য হলেও তাকে এই স্বার্থপর মানুষগুলো সহযোগিতা করতে পারছে না। ভীষণরকম স্বার্থপর মানুষগুলো গোটা সমাজের জন্যই হুমকি।

এই সূরায় তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে,

> "তারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।" (সুরা আল মুতাফফিফিন: আয়াত ২-৩)

এই সব অসৎ ও স্বার্থপর লোকদের অসততা কেবলমাত্র কেনা-বেচার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই জাতীয় অসততাগুলো পরিলক্ষিত হয়।

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের সম্পদ ও অবস্থানকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু অন্যের সম্পদকে তারা নিছক খেলার মতো করেই বিবেচনা করে। কোনো সমাজে যদি এই ধরনের সাংঘর্ষিক ও স্বার্থপর মানসিকতার চর্চা বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই সমাজ ইতিবাচকভাবে বিকশিত হতে পারে না। এ ধরনের স্বার্থপর মানুষগুলো যখন সমাজের দায়িত্বশীল অবস্থানে পৌঁছে যায় তখন অপরের উন্নতি করার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়।

> "যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকান্ডকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, তারা সম্পদের মোহে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।" (সুরা আন নমল: আয়াত ৪-৫)

আল্লাহর প্রতি যদি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় এবং কেউ যদি শেষ বিচারের দিনকে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে থাকে তাহলে এই ধরণের অপকর্ম এবং স্বার্থপরতা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারবে। সেই সাথে অন্যের হক নষ্ট করার ব্যাপারেও তার মধ্যে ভয় কাজ করবে। এই সূরায় তাই বলা হয়েছে যে,

> "তারা কি চিন্তা করে না, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।" (সুরা আল মুতাফফিফিন: আয়াত ৪-৬)

হুট করে করা কিছু ভুলের উপর ভিত্তি করে পরকালে একজন বান্দার ভাগ্য নির্ধারিত হবে না। যদিও প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এই সামান্য ভুলেই সম্ভাব্য শাস্তির ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকবে। মূলত পরকালের শাস্তিগুলো প্রযোজ্য হবে ইচ্ছাকৃত এবং ক্রমাগতভাবে ভুল করে যাওয়ার জন্য। একটি হাদীসে রাসুল (সা.) বলেছেন যখন কোনো মানুষ

একটি পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি খারাপ দাগ বসে যায়। কেউ যদি সে পাপের ফলে অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমা চায় বা তাওবা করে তাহলে তার অন্তরের দাগটি মুছে অন্তরটি আবার পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি বারবার একই অপরাধ করে তখন অন্তরে সেই খারাপ দাগটি ক্রমাগতভাবে বড় হতে থাকে এবং একটা সময় এতটাই বড় হয় যে গোটা অন্তরকেই সেই কালো রঙের দাগটি আচ্ছাদিত করে ফেলে।"

এই সূরা যেন সেই একই বার্তা দিয়ে যাচ্ছে

> "বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সুরা আল মুতাফফিফিন: আয়াত ১৪-১৬)

প্রখ্যাত ইসলামী দার্শনিক হাসান আল বসরী বলেন অন্তরে যে দাগ বসে যায় তা মূলত বারবার একই অপরাধ করার ফল। যদি তাকে সময়মতো না মোছা হয় তাহলে পরিণতিতে এই দাগটি একসময় বড় হয়ে অন্তরকে অকার্যকর ও অন্ধ করে ফেলে।

খারাপ ব্যবহার করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং যারা পশুর মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যেহেতু তারা নিজেদের জীবনাচরণ ও নৈতিক মুল্যবোধকে উন্নত করার কোন প্রচেষ্টা নেয় না তাই তাদের পরিণতি হবে অসম্মানজনক। এই সূরায় পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে

> "এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে (জাহান্নামের নোংরা স্থান) আছে। আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের, যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে।" (সুরা আল মুতাফফিফিন: আয়াত ৭-১১)

অন্যদিকে যারা ঈমান লালন করেন, আল্লাহর প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা পূরণ করবার জন্য হাসিমুখে সকল ধরনের বিপদ আপদ ও সংগ্রামকে মেনে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধানকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে সেদিন তাদের ভাগ্য হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সুরায় সেই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে

> "কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে (জান্নাতের সুউচ্চ স্থান)। আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন।" (সুরা আল মুতাফফিফিন: আয়াত ১৮-২৪)

ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানেরা ঈমান কীভাবে ধারণ করতে হয় তার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তারা ঈমানের পরীক্ষায় টিকে থাকতে গিয়ে অনেক বেশি কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। যেমনটি সূরায় বলা হয়েছে যে

> "যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত। এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত।" (সুরা আল মুতাফফিফিন: আয়াত ২৯-৩১)

আল্লাহ তাআলা তাদের সকল কষ্টের উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন এবং তাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার নির্ধারন করে রেখেছেন।

একই দৃশ্য আমরা আমাদের এই জীবনেও দেখতে পাচ্ছি। যারা অবিশ্বাসী, যারা পাপী তারা আজও বিশ্বাসী ও ঈমানদার বান্দাদেরকে অপমান করছে নিগৃহীত করছে নির্যাতন করছে এবং নানাভাবে হেয় করার চেষ্টা করছে। এটা নতুন কোন চিত্র নয়। আর সত্যিকারের বিশ্বাসী বান্দারা এই দৃশ্য দেখে হতাশ হবে না, কোনো অভিযোগও করবে না, কারণ তারা তাদের পূর্বসূরী উত্তম মুসলমানদের ইতিহাস জানেন।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সাফল্য আর সৃজনশীলতার অনুপম উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের সেই সমস্ত ইতিবাচক কর্মকান্ডের প্রভাব গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। যার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব সভ্যতা আজ সাফল্যের স্বর্ণশিখরে এসে পৌছেছে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ের মুসলমানরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি। তারা একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের উত্তরাধিকার হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা তাদের পূর্বসূরীদের মত মেধা এবং সম্পদকে কাজে লাগাতে পারেনি। তারা ইসলামের সুমহান শিক্ষাকে নিজের জীবনে যেমন ধারণ করতে পারেনি তেমনি সামষ্টিকভাবে সকলের কাছে ইসলামের বার্তাও পৌঁছে দিতে পারেনি। আজকের সময়ে এসে ঈমানদার বান্দাদেরকে তাই দুটো প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। একটি হল আভ্যন্তরীণ আর অন্যটি বাহ্যিক। অবস্থা এমন, একটি সমস্যা মোকাবেলা করতে গিয়েই যেন আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমিন।

সূরা আল-ইনফিতার

মহাবিপর্যয়/ সর্বগ্রাসী প্লাবন

পার্থিব এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষের উচিত বারবার আকাশ পানে তাকানো। সাজানো-গোছানো তারাগুলোকে দেখা। যে অপূর্ব ভারসাম্য এবং নান্দনিকতার ভেতর দিয়ে এই আকাশকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা উপলব্ধি করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে,

> "তিনি সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (সুরা আল মুলক: আয়াত ৩)

যখন কিয়ামতের সেই ক্ষণটি চলে আসবে তখন প্রত্যেকটি বিষয় উলটপালট হয়ে যাবে। এই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই সূরায় প্রথমেই বলা হয়েছে যে,

> "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন তারাগুলো একে একে ঝরে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে,এবং যখন কবরসমূহ উম্মোচিত হবে,তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে যে তার দুনিয়াবি জীবনে কী সব ভালো ও মন্দ কাজ করেছে।" (সুরা আল ইনফিতার: আয়াত ১-৫)

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটাকে একটু কল্পনা করার চেষ্টা করুন। মনে করুন, আপনার চিরচেনা আকাশে ফাটল দেখা দিয়েছে। তারাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করছে, ঝরে পড়ছে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে পড়েছে। সুনামির মতো ঢেউ দেখা দিচ্ছে। প্রত্যেকটা কবর খুলে গিয়েছে। আজ অবধি যত মৃতদেহ কবরগুলোতে শোয়ানো হয়েছিল, প্রত্যেকটি লাশ আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। এই বিশাল জমিন ভূগর্ভস্থ সব জিনিস বমির মত করে বের করে দিচ্ছে। সকল মৃত প্রাণীগুলোকে আবার জীবিত করা হচ্ছে। সে এক হতবিহবল হয়ে যাওয়ার মত দৃশ্য, যখন হিতাহিত জ্ঞান বলতে কিছুই থাকবে না।

এই ভয়ঙ্কর ছবি মনে তৈরি করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেছেন। এরপর আল্লাহ নাফরমান বান্দাদেরকে উপহাস করে বলেছেন,

> "হে মানুষ, কোন জিনিসগুলো তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।" (সুরা আল ইনফিতার: আয়াত ৬-৮)

প্রতিটি মানুষের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত কেয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে আমার অবস্থান কী হবে? শেষ বিচারের দিনে সেই ঘটনাগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য আমি এখনো পর্যন্ত কী প্রস্তুত করেছি? পার্থিব এই জীবনে মানুষ অহরহ আল্লাহ প্রদত্ত বিধানগুলোকে অগ্রাহ্য করে এবং নিজেদের খেয়ালখুশি মতো জীবন পরিচালনা করে বিপথগামী হয়। আল্লাহ তাআলা যেভাবে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে বলেছেন, ইবাদত করতে বলেছেন, কুরবানী করতে বলেছেন; খেয়াল খুশিমত চলা মানুষগুলো তা করতে পারে না। বরং তারা নানা ধরনের অজুহাত দাঁড় করিয়ে এই কাজগুলো থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

অধিকাংশ মানুষের জন্যই কেয়ামতের দুর্বিষহ ঘটনাগুলো বিরাট বড়ো আঘাত এবং উদ্বেগের বিষয় হিসেবেই আসবে। আর তখনই তাদেরকে বলা হবে যে,

> "তোমরা এতদিন শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে এসেছো। অথচ, তোমাদের প্রত্যেকের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। তারা সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তোমরা যা কর, তার সবটাই তারা জানেন।" (সুরা আল ইনফিতার: আয়াত ৯-১২)

গোটা জীবন জুড়ে একজন মানুষ যা করছে, যা বলছে, যা দেখছে আল্লাহ তাআলার বিশ্বস্ত ফেরেশতারা প্রতিটি মুহূর্তে তা সংরক্ষণ করছেন। শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মানুষের হাতেই একটি বস্তুনিষ্ঠ, সত্য এবং পরিপূর্ণ আমলনামা তুলে দেওয়া হবে।

> "সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে। এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে;" (সুরা আল ইনফিতার: আয়াত ৯-১২)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সুরার শেষ আয়াতে শেষ বিচারের দিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এটা হলো এমন একটা দিন যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। উপকার করতেও পারবে না।

> "যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।" (সুরা আল ইনফিতার: আয়াত ১৭)

সুরা আত তাকভীর

এই সূরায় ১২টি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো পুনরুত্থান এবং শেষ বিচারের দিনের সাথে সম্পৃক্ত।

১. যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে (সূরা তাকভীর: আয়াত ১)। অর্থাৎ সূর্যের আলো এবং শক্তি হারিয়ে যাবে এবং গোটা পৃথিবী ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন পড়বে।

২. যখন তারাগুলো খসে খসে পড়বে। (আয়াত ২)। এই তারাগুলো সেদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে ও বিক্ষিপ্ত পথে ছুটোছুটি করবে।

৩. যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে। (আয়াত ৩)। পাহাড়গুলো সেদিন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে এবং আবর্জনার মতো ভেসে বেড়াবে।

৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে;(আয়াত ৪)। এই কথাটি ইঙ্গিতপূর্ণ। ১০ মাসের গর্ভবতী উট খুবই আকাঙ্খিত একটি বিষয়। কারণ, তখন এমন একটি সময় উপস্থিত যে শিশু উটটি অল্প সময়ের মধ্যেই বের হয়ে আসবে। অথচ চারিপাশের পরিস্থিতি সেদিন এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠবে যে, এত লোভনীয় বিষয়ের প্রতিও মানুষ আর মনোযোগ দিতে পারবে না।

৫. যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (আয়াত ৫)। অর্থাৎ অনেক দূর-দূরান্তে যেখানে বন্যপ্রাণী তাদের আবাসস্থল তৈরি করেছিল সেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসবে এবং সবগুলো প্রাণী একসাথে থাকবে।

৬. যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (আয়াত ৬)। অর্থাৎ সমুদ্রের ঢেউ অবিশ্বাস্য উঁচু হয়ে ভূমির উপর আছড়ে পড়বে। আসার পথে আরো যা কিছু পড়বে সব কিছুকেই সেই উত্তাল ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

৭. যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, (আয়াত ৭)। তার মানে হল আত্মাগুলোকে আবার তার শরীরের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আত্মা এবং শরীরকে এখানে যুগল বা জোড়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত (গেড়ে ফেলা) কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে (আয়াত ৮-৯) যে শিশুকন্যাকে একেবারে শিশু অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল বা যে শিশুকন্যাদেরকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছিল তাদেরকে সেদিন প্রশ্ন করা হবে। কী অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তা জানা হবে।

৯. যখন আমলনামা খোলা হবে, (আয়াত ১০)। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের সামনে তার পার্থিব জীবনযাপনের ইতিহাসকে উপস্থাপন করা হবে।

১০. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (আয়াত ১১)। আকাশ সেদিন সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় রূপান্তরিত হবে।

১১. যখন জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে (আয়াত ১২)। অর্থাৎ জাহান্নামের বাসিন্দাদেরকে গিলে খাওয়ার জন্য এই ভয়ঙ্কর আগুনকে সেদিন প্রস্তুত করা হবে।

১২. এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, (আয়াত ১৩)। অর্থাৎ বেহেশত ঈমানদারদের কাছে চলে আসবে এবং সব ধরনের বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ ঈমানদার মানুষদের সামনে উম্মুক্ত করে দিবে।

সেদিনটি হলো সেই ক্ষণ যখন প্রতিটি আত্মা জেনে যাবে যে তারা দুনিয়াতে কী করে এসেছে।

> "তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কী উপস্থিত করেছে।" (সূরা তাকভীর: আয়াত ১৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলো পুনরুত্থান এবং মানুষের অন্তিম চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেয়। যদিও সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থান খুবই ক্ষুদ্র। সূর্যের চারপাশে যে গ্রহগুলো ঘুরছে পৃথিবীর মধ্যে কনিষ্ঠতম একটি গ্রহ। আবার গোটা বিশ্ব জগতের তুলনায় এই সৌরজগতটি খুবই ক্ষুদ্র। তারপরও এই ছোট্ট পৃথিবীর বাসিন্দা মানুষকে আল্লাহর সকল সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠতম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তারপরও মানুষ আল্লাহর হুকুমগুলোকে সঠিক উপায় মান্য করে না। এবং তার বার্তাগুলোকেও অগ্রাহ্য করে যায়।

এই সুরায় আল্লাহ তাআলা সকল নক্ষত্র আর তারাপঞ্জিকে আদেশ দিয়েছেন যাতে তারা কুরআনের বৈধতা এবং যথার্থতার সাক্ষী হয়ে থাকে। সেইসাথে আল্লাহতায়ালা নবি মুহাম্মাদকে (সা.) বিশ্ববাসীর জন্য যেভাবে হেদায়েত ও রহমত হিসেবে দান করেছেন সেই বিষয়টির ক্ষেত্রেও তাদেরকে সাক্ষী করা হয়েছে।

> "আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পিছনে সরে যায়। চলমান হয় আবার অদৃশ্য হয়, এবং যখন রাত তার অন্ধকারকে মেলে দেয়, আর সকালের সেই আলো যা রাতের অন্ধকারকে কাটিয়ে দেয়। নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী" (সূরা তাকভীর: আয়াত ১৫-১৯)

দৃশ্যমান এই পৃথিবীর বিশালতা আল্লাহর প্রেরিত ওহীর অলৌকিকতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করে। আল কুরআনের অলৌকিকতা এবং যথার্থতা- আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব এবং ক্ষমতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। কুরআন শরীফের তেলাওয়াত মানুষের মন এবং হৃদয়কে আন্দোলিত করে এবং মানুষকে বিশ্বজগতের অন্য সব সৃষ্টির সাথে ভারসাম্য করে চলার মতো উপযোগী করে তোলে। কারণ অন্য সব সৃষ্টি সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রেখেই নিজ নিজ কার্যক্রম পরিচালনা করে যায়।

এই সূরায় ফেরেশতা জিব্রাইলের (আ.) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে জিব্রাইলকে (আ.) রূহ তথা আল কুদস হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, তিনি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বিশ্বস্ত একজন ফেরেশতা। এই সূরায়ে জিবরাইল (আ.) সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

> "যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।" (সূরা তাকভীর: আয়াত ২০-২১)

মূলত জিব্রাইল (আ.) আল্লাহর নবি মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে ওহীগুলোকে পৌঁছে দিতেন। নবি মুহাম্মদ (সা.) আবার আয়াতগুলোকে ঠিক সেভাবেই মানুষের সামনে উপস্থাপন করতেন। রাসুল (সা.) কুরআনের শিক্ষা এবং চেতনাকে নিজের ভেতরে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। নিজের জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। ব্যক্তি জীবন এবং আচার-আচরণকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করেছিলেন। ফলে, যে কাজগুলো এক সময় অসাধ্য বলে মনে হতো তিনি সেগুলোকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। তার সেই পরিশ্রম এবং কর্মউদ্যেগের উপর ভিত্তি করেই একটি সফল সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- যা কালক্রমে বিশ্বের প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

যদিও এই সুরাটি কুরআনের প্রথম দিককার সূরা, তা সত্ত্বেও এই বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের সুমহান বার্তাকে এই সুরায় সফলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মক্কায় যারা ইসলামের মর্যাদাহানি করার চেষ্টা করেছে এই সুরায় তাদেরকেও স্পষ্টভাবে অপমান করা হয়েছে।

> "এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এটা তো কেবল বিশ্বাবাসীদের জন্যে উপদেশ, তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়।" (সূরা তাকভীর: আয়াত ২৫-২৮)

মানুষের দায়িত্ব হল শুধুমাত্র চেষ্টা চালানো। যে যতটুকু চেষ্টা করবে আল্লাহ তাআলা তার আলোকেই তার পুরস্কার নির্ধারণ করবেন। কেননা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে মানুষ কিছুই করতে পারে না।

> "তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না।" (সূরা তাকভীর: আয়াত ২৯)

সুরা আল আবাসা

একদিন রাসূলে করীম (সা.) কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যাক্তিদের একটি আয়োজনে বক্তব্য রাখছিলেন। যদিও মুসলমানদের সংখ্যা তখনও বেশ কম তথাপি তিনি আশা করছিলেন যে, এই স্বল্প সংখ্যক মুসলমান দিয়েই তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবেন এবং ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারবেন। রাসুল (সা.) বক্তব্য দিচ্ছেন ঠিক এমনই সময়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) নামক একজন অন্ধ ব্যক্তি তাকে থামালেন। তিনি নবিজির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং নবিজিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। বক্তব্যের মাঝখানে এরকম ছেদ পড়ায় রাসুল কিছুটা বিব্রত ও বিরক্ত হলেন। তার চেহারায় সেই বিব্রত ভাবটি প্রকাশও পেয়ে গেল। রাসুল (সা.) অন্ধ মানুষটির প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বরং তার বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন।

এই হলো সুরা আবাসার প্রেক্ষাপট। সুরার শুরুতেই তাই বলা হয়েছে

> "তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি আগমন করল। আপনি কী জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত কিংবা আপনার উপদেশে তার হয়ত উপকার হত।" (সুরা আল আবাসা: আয়াত ১-৪)

এই ঘটনার পর থেকে রাসুলের (সা.) দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং তিনি ইবনে উম্মে মাকতুমকে (রা.) খুবই গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। এরপর থেকে এই অন্ধ মানুষটিকে দেখলেই রাসুল (সা.) বলে ওঠতেন যে, ইবনে উম্মে মাকতুম হল সেই ব্যক্তি যার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমাকে সতর্ক করেছেন। পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করার পরের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবিজি (সা.) যখনই শহরের বাইরে কোথাও যেতেন তিনি মদিনার দায়িত্ব ইবনে উম্মে মাকতুমকে (রা.) দিয়ে যেতেন।

এই সুরার পরবর্তী অংশে আল্লাহ তাআলার সুমহান বার্তাকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বার্তাটিকে মৌখিকভাবে বা লিখিত ভাবে মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। এটাই আমাদের দায়িত্ব। যারা আল্লাহ তাআলার এই বার্তাকে গ্রহণ করবে বা মেনে নিবে তাদের তাদের উচিত নিজেদের জীবনে এই শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো। আল্লাহর আহবানে সাড়া দেয়া এবং পরকালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। যদিও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে ইতিবাচকভাবে সাড়া দেয় না।

অনেক মানুষ একটু উদাসী বা অন্যমনস্ক ধরনের হয়। তারা কীভাবে সৃষ্টি হল বা কীভাবে এই পৃথিবীতে এলো- তা নিয়ে তারা খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। মূলত একটি মানুষের জন্মের সূচনা হয় এক ফোটা তরল শুক্রানু থেকে। সেখান থেকে পরবর্তীতে মানুষ একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি পায়। খুব কম সংখ্যক মানুষ আছে যারা সৃষ্টিতত্ত্বের এই বিষয়টিকে প্রকৃতপক্ষে অনুধাবন করতে পারে। আর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় অথচ আল্লাহ তাআলাই হলেন মানুষের অস্তিত্ব এবং বেঁচে থাকার মূল উৎস। মানুষের বেপরোয়া চলাফেরা এবং ঔদ্ধত্য আচরণ দেখে আল্লাহ তাআলা এই সুরায় কিছু প্রশ্ন তুলেছেন:

> "তিনি তাকে কী বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রানু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন,অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।" (সুরা আল আবাসা: আয়াত ১৮-২২)

যাপিত জীবনে মানুষ এই সত্যগুলো ভুলে যায় এবং জাগতিক সখ-আহলাদ ও চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হয়ে যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা সময় গিয়ে মানুষ আল্লাহর প্রতি নিজের নির্ধারিত দায়িত্বগুলোকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। এই সূরায় আল্লাহ মানুষের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকে কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং মানুষকে সঠিক পথে ফিরে আসার তাগিদ দিয়েছেন।

> "যে কোনো মুল্যে মানুষকে আল্লাহর প্রতি তার করনীয় দায়িত্বগুলো পালন করে যেতে হবে।" (সুরা আল আবাসা: আয়াত ২৩)

যারা ধূর্ত এবং অবিশ্বাসী তারা কিয়ামতের দিন এবং পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে অহেতুক বিতর্ক করে। তারাই এই সত্যগুলোকে মানতে অস্বীকার করে। বরং তারা তাদের ইহজাগতিক অস্তিত্ব নিয়েই কেবলমাত্র ব্যস্ত থাকে। এই সুরায় পুনরুত্থান দিবসের সপক্ষে খুব সামান্য কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে,

> "মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক,আমি বিস্ময়কর উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি,এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য,আঙ্গুর, শাক-সবজি,যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান।" (সুরা আল আবাসা: আয়াত ২৪-৩০)

কীভাবে এই সবগুলো বিষয় ঘটলো? কীভাবে এত এত গাছ ফলমূল এবং উদ্ভিদ নানা ধরনের বিচিত্র ঘ্রান, রং এবং আকৃতিতে আবির্ভূত হতে পারল? কোনো বিশাল শক্তি সামান্য ময়লা আবর্জনা থেকে এভাবে গাছপালা তৈরি করতে পারেন? যিনি এত কিছু পারছেন কেন মৃত্যুর পরে তিনি আবার মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবেন না? এমনটা তো করতেই হবে যাতে প্রত্যেকটা মানুষ তার কর্মফল দেখতে পারে।

এই সুরার পরের অংশে আরও বলা হয়,

> "অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক আওয়াজ আসবে,সেদিন মানুষ তার ভাই, মা-বাবা,স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। সেদিন প্রত্যেকেরই শুধু নিজেকে নিয়েই চিন্তা থাকবে যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।" (সুরা আল আবাসা: আয়াত ৩৩-৩৭)

অথচ, আজ এত এত সুযোগ আর নেয়ামতের মাঝে থাকার পরও মানুষের মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নাম কিংবা পুরস্কার বা শাস্তি নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই।

সে দিনটি প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন,

> "অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল,সহাস্য ও প্রফুল্ল। এবং অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে ধুলি ধূসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে।তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।" (সুরা আল আবাসা: আয়াত ৩৮-৪২)

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আধুনিক বিজ্ঞান এতটা অগ্রগতি অর্জনের পরও এখনো বস্তুগত ও বাস্তব ব্যাখ্যার বাইরে যেতে পারছে না। এখনো পর্যন্ত অধিবিদ্যা এবং ইন্দ্রিয় ও দর্শনের বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নানা সীমাবদ্ধতা কাজ করছে।

সুরা আন নাযিআত

> "শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন (রূহ কবজ) করে। শপথ তাদের, যারা মৃদুভাবে আত্মার বাঁধন খুলে দেয়। শপথ সেই তারাগুলোর, যেগুলো দ্রুতগতিতে চলাচল করে, দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। এবং শপথ তাদের, যারা বৈষয়িক সব কাজ করে যায়। মনে রেখো, কেয়ামত অবশ্যই হবে।" (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ১-৫)

এই সুরার প্রথম আয়াতের ব্যাপারে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা হলো, এখানে সেই সব ঐশ্বরিক কাঠামোর কথা বলা হয়েছে যেগুলো সবসময় একটি চলমান গতিতে মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়। অথচ তাদের চলাচলের জন্য কোনো ইঞ্জিন নেই। অথবা তাদেরকে পথ দেখাবার জন্য কোনো আলোকবর্তিকা বা গতিম্যাপও নেই।

মহাকাশের এই জটিল কাঠামো একটি সময় হুট করে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মহাশূন্যে ভাসমান সব বস্তুও উধাও হয়ে যাবে। আর এই ঘটনাটি ঘটবে, যখন প্রচন্ড শব্দে কিয়ামতের ক্ষণগুলো শুরু হয়ে যাবে।

> "যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী আওয়াজ, আর তারপর থেকে একটার পর একটা তোলপাড় করা বিপর্যয় আসতেই থাকবে।" (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ৬-৭)

প্রচন্ড শব্দের সেই ভূমিকম্পটি সবকিছুকেই ধ্বংস করে মিশিয়ে দেবে। পুরো পৃথিবীটাই যেন উপর নীচে লাফাতে থাকবে। মানুষের অন্তর ভয়ে তটস্থ হয়ে যাবে। তারা নানা ধরনের আশঙ্কা আর প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি এতদিন যারা কিয়ামত নিয়ে সন্দিহান ছিল তারাও তখন বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করবে।

> "আমরা কী আসলেই আবার জীবন ফিরে পাবো; এমনকি গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও?" (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ১০-১১)

ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে অনেকেই আল্লাহ তাআলার পাঠানো বার্তা তার প্রেরিত রাসূলগণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। বিশেষ করে, যারা অবিশ্বাসী, তারা মানতেই চায় না যে, একবার মৃত্যু হওয়ার পর আবারো কাউকে জীবন দেওয়া যেতে পারে। তাই তারা মনে করে,

> "যদি আসলেই আমাদেরকে আবার জীবন ফিরিয়ে দেয়া হয় তা হবে ভয়ঙ্কর ধরনের লোকসান।" (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ১২)

একটা সময় এই অবিশ্বাসী মানুষগুলো অনুধাবন করতে শুরু করে যে, এতদিন যেভাবে তারা সত্যকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেছে এবং নাফরমানী করেছে- তা সঠিক হয়নি। তারা আরো উপলব্ধি করে যে, কিয়ামতের এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য প্রকৃতপক্ষে তারা কোনো প্রস্তুতিই নেয়নি। এই সুরায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> "অতএব, এটা তো কেবল এক মহা-প্রলয়ংকারী শব্দ। অল্পপরই তাদেরকে আবার জীবিত করে ময়দানে হাজির করা হবে।" (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ১৩-১৪)

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর নাস্তিকেরা মানসিকতার দিক থেকে ষষ্ঠ শতকের পৌত্তলিক আরবদের থেকে খুব একটা ভিন্ন কিছু নয়। কেননা সেই সময়ের পৌত্তলিক আরবেরাও আজকের দিনের নাস্তিকদের মতই জাগতিক বোধসম্পন্ন ছিল। তাদের অবস্থা ছিল এরকম যে- মানুষ জন্ম নিবে, বড়ো হবে, মারা যাবে। তারপর তাদেরকে দাফন করে দেওয়া হবে। এর বাইরে আর কোনো জীবন নেই। আর কোনো কর্মকান্ডও নেই। এই ধরনের অসচেতন ও অসতর্ক মানুষেরা কী বলবে- যখন তাদেরকে আবার জীবন ফিরিয়ে দেয়া হবে?

এই সুরার পরবর্তী অংশে একগুঁয়েমি ও ঔদ্ধত্যের নমুনা বোঝাবার জন্য ফেরাউনের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের মতো আদিম মানসিকতার লোক এখনো অহরহই দেখা যায়। এরা মূলত স্বার্থপর, রুক্ষ হয় এবং নিজেকে অনেক বড়ো বলে মনে করে। তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের কোনো ধারণা এবং চর্চা থাকে না। তারা অন্যের অধিকার নষ্ট করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

এরপর, এই সূরায় গোটা মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলা হয়েছে। অবিশ্বাসী মানুষের ভেতরে যে উদাসীনতা ও দায়সারা ভাব দেখা যায়; আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রেও তাদের যে অনীহা সেই প্রসঙ্গেও এই সুরায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

> “তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।” (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ২৭-২৮)

বিশালকায় অন্য অনেক সৃষ্টির তুলনায় মানুষ খুবই ছোট এবং ক্ষুদ্র। তাই মানুষের মনে রাখা উচিত, এত ক্ষুদ্র হওয়ার পরও যখন তারা সত্যকে অস্বীকার করে, তখন তারা মূলত স্বৈরাচার ও নাফরমানির চেহারায় আবির্ভুত হয়। অথচ মানুষের এমন হওয়া মোটেও কাম্য নয়। মানুষের উচিত আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা কামনা করা। অনেক সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার মত ক্ষমতাও মানুষকে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার সুস্থ প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। কোনো সৃষ্টিই যেন মানুষের কর্মকান্ডের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে মনোনিবেশ করা দরকার। সর্বোপরি মানুষের উচিত আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা এবং প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দেয়া রহমতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

এই সুরার শেষাংশে এসে আবারো সুরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোর মত একই বার্তা দেওয়া হয়। অর্থাৎ আবারো সেই পুনরুত্থান, শাস্তি এবং পুরস্কার প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করা হয়। বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, পৃথিবীর জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার জীবন পরকালীন স্থায়ী জীবনে যাওয়ার একটি মাধ্যম মাত্র।

> “অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে।” (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ৩৪-৩৬)

সেদিন মানুষ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে একটি দল পৃথিবীতে নিজেদের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনার হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছিল। আর আরেকটি দল, যারা আল্লাহর ইবাদত করেছিল এবং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের পক্ষে ভূমিকা পালন করেছিল।

> "তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে; এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ৩৭-৪১)

যদিও এইসব দুনিয়াবি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিরা আল্লাহর দেয়া বিধানকে অস্বীকার করেছে, তারপরেও কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তেও তারা ধৃষ্টতা দেখাতে কার্পণ্য করবে না।

> "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক ? এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে।" (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ৪২-৪৪)

যখন এই অবিশ্বাসীরা জানতে পারবে, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সময় শেষ। তখন তারা বুঝতে পারবে, পরকালীন জীবনকে সুন্দর করার জন্য তারা কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারেনি। কিন্তু সেই সময়ের এই উপলব্ধি দিয়ে তাদের আর কোনো উপকার হবে না। মানুষের অস্তিত্ব হল একটি পূর্ণ এবং চক্রাকার বৃত্ত-যেখানে প্রতিটি কাজ ও বিষয়ই একই বৃত্তে আবর্তিত হতে থাকে। আর মৃত্যু হল পরবর্তী স্তরে যাওয়ার আগে একটি সাময়িক বিরতি। অন্যদিকে, পরকালীন জীবনই হলো প্রকৃত জীবন যেখানে আমরা এই সংক্ষিপ্ত পার্থিবজীবনের গুরুত্বকে মূল্যায়ন করতে পারবো। এই সুরার শেষ আয়াতে সেই বাস্তবতাই তুলে ধরা হয়েছে

> "যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।" (সুরা আন নাযিয়াত: আয়াত ৪৬)

সূরা আল নাবা

(মহাসংবাদ)

প্রতিটি জাতির কাছে একজন করে বার্তাবাহক পৌঁছেছে এবং তারা ওহীর বার্তাও পেয়েছে। যখন কোনো জাতির উপর একজন বার্তাবাহক কিংবা নবী ও রাসূল পৌঁছায় তখন সে জাতির লোকদের অধিকার আছে সেই বার্তাবাহকের যোগ্যতার বিষয়ে কিংবা তার দাবির যথার্থতার বিষয়ে প্রশ্ন তোলার। এমনকি সেই বার্তাবাহককে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করার।

আসুন আমরাও আমাদের নবি এবং তার দাবিগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করি। নবি মুহাম্মদ (সা.) কী দাবি করেছিলেন? তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। তার দাবির স্বপক্ষে তিনি কিছু শক্তিশালী এবং অভূতপূর্ব যুক্তি এবং প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন আল্লাহ এক এবং একক। তিনিই আসমান ও জমিন এবং এতে বিদ্যমান সকল সৃষ্টিকুলের একমাত্র স্রষ্টা। এই বিশ্বজগতের প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা এবং ইচ্ছার কাছেই আত্মসমর্পণ করে। তিনি আরো বলেছিলেন কিয়ামতের দিন আসবেই এবং প্রতিটি পরিণত মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য সেদিন জবাবদিহি করতে হবে। তিনি এই প্রসঙ্গে কুরআনের এই আয়াতটি ঘোষণা করেছিলেন যে, শেষ বিচারের দিনে

> “অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।” (সুরা যিলযাল: আয়াত ৭-৮)

কোনো একজন মানুষ কেন নিছক এই দাবিগুলো তোলার জন্য নবী মুহাম্মদকে (সা.) প্রত্যাখ্যান করবে? প্রশ্ন জাগে, এর চেয়ে উন্নত কোনো বার্তা নিয়ে আর কেউ কী কখনো এই পৃথিবীতে এসেছে?

এই সুরায় মক্কায় বসবাসরত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলোকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.) যা বলছেন তাতে যদি তোমরা সন্তুষ্ট না হও; তাহলে তোমরা খালি চোখেই তোমাদের চারপাশকে দেখো। এবং সৃষ্টিকূলের মাঝে লুকায়িত নিদর্শনগুলোকে পর্যবেক্ষণ করো। এই সূরায় বলা হয়েছে,

> “আমি কী ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে পেরেক আকৃতি করিনি? আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী, রাত্রিকে করেছি আবরণ। দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়। তোমাদের মাথার উপর মজবুত সাত-আকাশ নির্মাণ করেছি এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, আর তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও পাতাঘন উদ্যান।” (সুরা আন নাবা: আয়াত ৬-১৬)

বিগত ১৪শ বছর জুড়ে মানব জাতি ইসলামের পাশাপাশি আরো অনেকগুলো ধর্ম এবং আদর্শের বিস্তার দেখেছে। প্রতিটি আদর্শের সত্যতা, যথার্থতা, বৈধতা এবং কার্যকারিতাও তারা অনুধাবন করেছে। এতসব পর্যবেক্ষণের পর এটাই বাস্তবতা যে, অন্য সকল আদর্শ মতবাদের তুলনায় ইসলামের অবস্থান শীর্ষে এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে। অন্যভাবে বলতে গেলে, নবি মুহাম্মদ (সা.) যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, শুধুমাত্র সেই বার্তাই নতুন ও পুরনো সকল ওহীর বার্তার প্রতিনিধিত্ব করে। নবি মুহাম্মদকে (সা.) যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে একই সঙ্গে তাকে

হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত ইব্রাহিমকেও (আ.) বিশ্বাস করতে হবে। ইসলাম ছাড়া বাকি যেসব ধর্ম ও মতাদর্শ আছে তার সবই হলো মানুষের মন গড়া এবং মানুষের হাতেই তৈরি।

বর্ণনাশৈলি ও উপস্থাপনার দিক থেকে এই সুরাকে চারটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে পৃথিবী এবং মানুষের গঠনের বিষয়ে কিছু বর্ণনা আছে যা ষোলতম আয়াত পর্যন্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সুরার পরবর্তী অংশে ১৭ থেকে ২০ আয়াত পর্যন্ত শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। যেমন:

> "নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে। এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।" (সুরা আন নাবা: আয়াত ১৭-২০)

তৃতীয় অংশে ২১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত পাপী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত জাহান্নামের বিভীষিকাময় শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

> "নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। তারা সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে।" (সুরা আন নাবা: আয়াত ২১-২৩)

চতুর্থ ও শেষ অংশে নেককার বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে পুরস্কার নির্ধারিত রেখেছেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

> "পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য। উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী। এবং পূর্ণ পানপাত্র।" (সুরা আন নাবা: আয়াত ৩১-৩৪)

বিশ্বাসী বান্দারা সেইদিন পরিপূর্ণ সুখ অনুভব করবে। তাদের মুখমন্ডল প্রশান্তি আর উজ্জ্বলতায় ঝলমল করবে। ফেরেশতাদের সাহচর্যে তারা তখন মহিমান্বিত রবের প্রশংসা করে যাবে। সেদিন তাদের সুখের কোনো সীমা থাকবে না। ফুটন্ত গোলাপের বাগানের মাঝে বিশ্বাসী বান্দারা বসে থাকবে। আর তাদেরকে সঙ্গ দিবে পূর্ণযৌবনা নারীরা। এই সূরায় আরো বলা হয়েছে

> "এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক।" (সুরা আন নাবা: আয়াত ৩৯)

সেই বিভীষিকাময় দিনে তারাই সফল হবে যারা এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ তাআলার হকের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। আর যারা ধূর্ত, যারা এই দুনিয়ার জীবনে তেমন কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি তারা সেদিন তাদের কৃতকর্মের জন্য আফসোস করবে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এই সূরার পরের আয়াতে মানুষকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যেক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবেঃ হায়, আফসোস-আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।" (সুরা আন নাবা: আয়াত ৪০)

হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে আমরা আরও কিছু প্রশ্ন দিয়েও যাচাই করতে পারি। যেমন:

ইসলামের এই সুমহান বার্তাটি মানুষের পৌঁছে দিয়ে নবিজির (সা.) এমন কী লাভ হয়েছে? ইসলামের বার্তা ও চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা করা কী কোনো অপরাধ? তৎকালীন স্বৈরাচারী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন এটাও কী কোন অপরাধ? নাকি এগুলো সবই তার সত্যের পক্ষে অবস্থানের সাক্ষ্য দেয়?